Volume 28 : 2025-2026
Journal of Philosophy and the Life-world
DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2026.28.00.25

রক্তকরবী: সময়ের দর্শন

শ্রুতিনাথ চক্রবর্তী

সময়ের কি সত্যিই কোনো অস্তিত্ব আছে? সময়ের কি আছে ছোটো-বড়ো আকার বা মাত্রা? সাধারণ মানুষের মতো দার্শনিকদেরও মুখোমুখি হতে হয় এসব জটিল প্রশ্নের। সময় বস্তুর মতো প্রত্যক্ষ নয়। ইন্দ্রিয়নির্ভর জ্ঞানেও (perceptive knowledge) তাকে পাওয়া যায় না। তাহলে সময় কি নিছক মানসিক বা মনন নির্ভর বিষয়? অ্যারিস্টটল জানিয়েছিলেন— সময় গতি ও পরিবর্তনের সঙ্গে অন্বিত বিষয়। গতি ও পরিবর্তনের সাপেক্ষেই বোঝা যায় সময়কে। তাই পরিবর্তন সম্পর্কে অবহিত না হলে সময় সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায় না। অ্যারিস্টটলের সুস্পষ্ট অভিমত:

> Time is defined as the measure of motion in regard to what is earlier and later. It thus depends for its existence upon motion. If there were no change in the universe, there would be no motion?[১]

একটি ছোটো কাঁচা আম ধীরে-ধীরে বড়ো হয় এবং অবশেষে পরিপক্ক হয়। আমের এই পরিবর্তন ঘটে কালের সংযোগে। কাল না থাকলে বস্তুর কোনো পরিবর্তনও সংঘটিত হবে না। দার্শনিক কান্টও ছিলেন এই ধারণার সমর্থক:

> The concept of change, and with it the concept of motion (as change of place), is possible only through and in the representation of time; —[২]

আর পরিবর্তন সম্পর্কে অবহিত হওয়ার জন্য প্রয়োজন হয় মনের। কেন না, মন না থাকলে পরিবর্তনকে বুঝবে বা উপলব্ধি করবে কে? সেজন্যেই শেষ পর্যন্ত অ্যারিস্টটলের সিদ্ধান্ত — সময়ের অস্তিত্ব মনের অস্তিত্বের উপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ, মন না থাকলে সময়ের কোনো অস্তিত্ব নেই:

> It(ime) also depends for its existence upon a counting mind. If there were no mind to count, there could be no time.... Time is the succession of thoughts.[৩]

কান্টের ধারণাতেও কালের অবস্থান আমাদের মনে। তিনি কালকে মানবমনের সংবেদনশক্তির বা শুদ্ধ অনুভবের (pure intuition) একটি পূর্বতঃসিদ্ধ আকার বা a-priori বলে মনে করেন।

© 2026 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2026.28.00.25

সেই সঙ্গে তাঁর অভিমত—কাল হল অসীম ও অখন্ড : "Time is an infinite magnitude in one dimension".[8]

কান্টের অনেক-অনেক আগে ভারতবর্ষের ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনও কালকে নিত্য ও অসীম বলে ঘোষণা করেছিল। বৌদ্ধ ও জৈন দর্শনও একথা স্বীকার করেছিল অবিসংবাদিত ভাবে। বস্তুত, ব্যবহারিক সুবিধার জন্যেই আমরা কালকে ঘড়ি-মাপা কালে, অর্থাৎ ঘন্টা, মিনিট, সেকেন্ড, দিন, মাস, বছর ইত্যাদি রূপে বিভাজন করি। প্রকৃতপক্ষে কালের মধ্যে এমন কোনো বিভাজন নেই। ভারতীয় দর্শনের মতো কান্টও তা স্বীকার করেন।

কান্টের আগে দার্শনিক লাইব্‌নিজ্ কিন্তু দেশ-কালের আলোচনায় অগ্রসর হয়েছিলেন সম্পূর্ণ ভিন্ন এক পথে। তাঁর মতে কাল যেমন বস্তুধর্ম নয়— যা বলেছিলেন গ্যালিলিও ও নিউটনের মতো বিজ্ঞানীরা— তেমনি মননধর্মও নয়। তাঁর সুস্পষ্ট বক্তব্য— কাল হল প্রকৃতপক্ষে অধ্যাস বা illusion। তার কোনো বাস্তব অস্তিত্ব নেই। যাকে আমরা কাল বলি তা আসলে ভ্রম-প্রত্যক্ষ। তাই এরই আলোচনায় লাইব্‌নিজ্ জানিয়েছিলেন যে, কাল হল আপেক্ষিক বা relative। এস. ক্লার্ককে লেখা তাঁর চিঠিতে (তৃতীয় চিঠিতে) তিনি বলেছিলেন:

"I have said more than once that I hold space to be something relative, as time is".[৫]

বিংশ শতাব্দীতে এসে সময় সম্পর্কে এই একই কথা বলেছিলেন বিজ্ঞানী আইনস্টাইন তাঁর 'Theory of Relativity' তে (1905) ।

দার্শনিক-বৈজ্ঞানিকদের এ-সব ধ্যান-ধারণা আশ্চর্যজনকভাবে অন্তঃস্যূত হয়ে আছে রবীন্দ্রনাথের কালচেতনায়। রবীন্দ্রনাথও কালকে জানেন মানসিক বিষয় হিসেবে। তিনিও কালকে দেখেন পরিবর্তনের সাপেক্ষে অধিত বিষয় রূপে। সেজন্যেই তাঁর 'শেষলেখা'-র কবিতায়(২ সংখ্যক) কবি বলেন:

> সবকিছু চলিয়াছে নিরন্তর পরিবর্তবেগে
> সেই তো কালের ধর্ম।[৬]

লাইব্‌নিজের মতো তিনিও কালকে মনে করেন অধ্যাস বা মায়া, এবং তা আপেক্ষিক। 'পশ্চিম যাত্রীর ডায়ারি'-র পরিশিষ্টে তাই তিনি লেখেন:

> ঘড়ি-ধরা অবিশ্বাসী সময়কে আপেক্ষিক অর্থাৎ মায়া বলে মানতে চায় না, সে জানে না-নিমেষই বল আর লক্ষ যুগই বল, দুইয়ের মধ্যেই অসীম সমানভাবে আছেন, শুধু উপলব্ধির অপেক্ষা।...[৭]
>
> দেশই বল, আর কালই বল, যাতে করে সৃষ্টির সীমা নির্দেশ করে দেয়, দুইই

© 2026 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

Volume 28 : 2025-2026
Journal of Philosophy and the Life-world
DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2026.28.00.25

আপেক্ষিক, দুইই মায়া।[৮]

এর অনেক আগে ইন্দিরা দেবীকে এক চিঠিতেও কবি লিখেছিলেন :

"আমার মনে হয় খণ্ড কাল এবং খন্ড আকাশ আমাদের মনের ভ্রম।"[৯]

বোঝা যায় রবীন্দ্রনাথ খণ্ড কালের অস্তিত্বে বিশ্বাসী নন। কান্টের মতো তিনিও কালকে অখণ্ড ও অন্তহীন বলে মনে করেন। এই অখণ্ড অন্তহীন কালকে কবি প্রায়ই তাঁর সাহিত্যে মহাকাল নামে অভিহিত করেন। 'শেষ সপ্তক' এর কবিতায় (৭ সংখ্যক) এই মহাকালকে সম্বোধন করে তিনি বলেন- "মহাকাল, সন্ন্যাসী তুমি।"[১০]

রক্তকরবী নাটকে আছে যেমন খণ্ডকালের ব্যবহার তেমনি আছে ব্যাপ্ত মহাকালের ব্যবহারও। রক্তকরবী নাটকের সমস্ত ঘটনাটি এক দিনের ঘটনা। ঘটনার শুরু হয়েছে সকালে। সকালের ইঙ্গিত আছে চন্দ্রা ও নন্দিনীর উক্তিতে। ফাগুলাল যখন বলে- "আমার মদ কোথায় লুকিয়েছ চন্দ্রা, বের করো।" — তার উত্তরে চন্দ্রা বলে: "ও কী কথা! সকাল থেকেই মদ?"। কিংবা, এই একই দিনে নন্দিনী বিশুকে বলে: "পাগল ভাই, দূরের রাস্তা দিয়ে আজ সকালে ওরা পৌষের গান গেয়ে মাঠে যাচ্ছিল, শুনেছিলে?"

নাট্যঘটনার সমাপ্তি-সূচক কোনো কালের ইঙ্গিত নাটকে নেই। তবে অনুমান করা যায় দিনের শেষেই এর সমাপ্তি ঘটেছে। কিন্তু এই একদিনের সময়সীমার মধ্যে ধরা দিয়েছে ব্যাপ্ত সময়সীমা। অথবা বলা যায়, ব্যাপ্ত কাল স্তরীভূত হয়ে আছে সীমিত কালের গভীরে। আর সেই স্তরীভূত সময়ের জীবাশ্মে-জীবাশ্মে ধরা আছে নানা সংঘটিত ঘটনা, নানা অনুভূতির আল্পনা, ও বিচিত্র অভিজ্ঞতার ইতিকথা। একটি গোটা যুগই যেন সংহত হয়ে আছে এক দিনের সময়সীমায়। সে যুগ সম্পদ ও ক্ষমতা- গৃধ্নতার যুগ, মানুষের অনুভূতিহীন যান্ত্রিক হয়ে ওঠার যুগ, এবং তার বিক্রয়যোগ্য পণ্যে পরিণত হওয়ার যুগ।

নাট্যঘটনার সূচনায় যে সকাল তা সকলের কাছে একই রকম নয়। ফাগুলালের কাছে যে-সকাল মদ-খাওয়ার সকাল বা নেশার সকাল, নন্দিনীর কাছে যে-সকাল পৌষের গানের তথা আনন্দের সকাল, বিশুর কাছে সেই সকালই অবসাদের ও হতাশার সকাল— তা "ক্লান্ত রাত্তিরটারই ঝেঁটিয়ে ফেলা উচ্ছিষ্ট"। লক্ষ করতে হয় 'উচ্ছিষ্ট' শব্দটি— যা বুঝিয়ে দেয় সকাল হল রাত্রিরই বর্জ্য পদার্থ। অর্থাৎ এ-সকালের কোনো নিজস্বতা নেই। নূতন হয়ে ওঠার কোনো প্রতিশ্রুতিও নেই এর গভীরে। এ হল রাত্রিরই অব্যবহার্য অংশ। তাই রাত্রির চেয়েও আরো অন্ধকার। সময় বিমূর্ত— তার কোনো নিজস্ব রূপ নেই। সময়ের রূপ বা উপাধি পরিগ্রহ করার জন্য প্রয়োজন হয় ঘটনার অনুষঙ্গ। অন্যভাবে বলা যায়— ঘটনার অস্তিত্ব ছাড়া সময় তার নিজের অস্তিত্ব প্রমাণ করতে পারে না। আর সেই ঘটনা যদি ব্যক্তিকেন্দ্রিক হয় তাহলে সময়কেও রঞ্জিত হতে হয় ব্যক্তিগত ঘটনার রঙে। সেজন্যেই একই সকাল ফাগুলাল, নন্দিনী ও বিশুর কাছে প্রতীয়মান হয়

© 2026 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

Volume 28 : 2025-2026
Journal of Philosophy and the Life-world
DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2026.28.00.25

ভিন্ন-ভিন্ন রূপে। হয়ে ওঠে আপেক্ষিক।

রক্তকরবী নাটকে আমরা সময়-বাচক কথন প্রথম লক্ষ করি নাটকের একেবারে সূচনায়— কিশোর ও নন্দিনীর কথোপকথনে। নন্দিনী যখন কিশোরকে বলে— "যা যা, এখনি কাজে ফিরে যা, দেরি করিস নে।" — তার উত্তরে কিশোর বলে:

> সমস্ত দিন তো কেবল সোনার তাল খুঁড়ে আনি, তার মধ্যে একটু সময় চুরি করে তোর জন্যে ফুল খুঁজে আনতে পারলে বেঁচে যাই।

নন্দিনীর কথায় যে সময়-চেতনার প্রকাশ তা সময়ের সর্বজনীন রূপকেই চিহ্নিত করে। তার 'দেরি' সর্বজনীন (Universal) সময়ের পরিপ্রেক্ষিতেই দেরি। অর্থাৎ, দিন-রাত্রি ঘন্টা-মিনিট-সেকেন্ডের যে-সময় সকলে মান্য করে— যাকে বলা হয় 'Universal Time'— নন্দিনীর 'দেরি' তারই সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। কিন্তু কিশোর যখন সময় 'চুরি' করার কথা বলে তখন বোঝা যায় সর্বজনীন বা বিশ্বগত সময়ের অংশকেই সে ব্যক্তিগত সময়ে পরিণত (convert) করে নিতে চায়। অর্থাৎ, সে গড়ে নিতে চায় নিজস্ব সময়ের এক ভুবন— যেখানে সে-ই হয়ে থাকবে সময়ের অধিপতি। 'ডাকঘর' নাটকের অমল যখন প্রহরীকে বলে " তুমি ঘণ্টা বাজিয়ে দিলেই তো সময় হবে", বা 'পুনশ্চ' কাব্যের 'শুচি' কবিতায় কবি যখন বলেন—

> প্রভাত কি শুধু রাত্রির অবসানে!
> যখনি জেগেছে চিত্ত
> শুনেছ বাণী
> তখনি এসেছে প্রভাত।

— তখন ধরা পড়ে সময়ের ব্যক্তিগত রূপের প্রকাশ।

বিশ্বগত সময়ে থাকে ব্যক্তি কর্তৃক সময়ের অনুগত হয়ে থাকার বিষয়। তাকে মানতে হয় সর্বজনমান্য সময়ের অনুশাসন। কিন্তু ব্যক্তিগত সময়ের ক্ষেত্রে ব্যক্তিই সময়কে করে তুলতে চায় তার অনুগত। এবং তখন বিশ্বগত সময়ের সমান্তরালভাবে চলতে থাকে ব্যক্তিগত সময়। সার্ত্রে এই দু-ধরনের সময়কে ধরতে চেয়েছেন তাঁর 'Condemned of Altona' নাটকে।

কিশোরের উক্তির সামান্য পরে অধ্যাপকও বলেন প্রায় এই একই ধরনের কথা। নন্দিনী যখন তাঁকে বলে "আমাকে নিয়ে সময়ের বাজে খরচ করবে কেন," তার উত্তরে অধ্যাপক বলেন— "এসো আমার ঘরে, তোমাকে নিয়ে একটু সময় নষ্ট করতে দাও।" অধ্যাপকের এমন ইচ্ছার মধ্যেও আছে বিশ্বগত সময়কে ব্যক্তিগত সময় করে নেওয়ার আকাঙ্ক্ষা। বিশ্বগত সময়ের অংশকে 'নষ্ট' করে— অর্থাৎ সেই সময়ে তাঁর প্রয়োজনীয় নির্দিষ্ট কাজ না করে তারই সমান্তরালভাবে ব্যক্তিগত সময়ের এক পরিসর গড়ে নিতে চান তিনি। সেই ব্যক্তিগত সময়ে নন্দিনীকে তত্ত্বকথা বুঝিয়ে দেওয়ার আনন্দে মগ্ন থাকতে চান অধ্যাপক।

© 2026 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

Volume 28 : 2025-2026
Journal of Philosophy and the Life-world
DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2026.28.00.25

যক্ষপুরীতে অধ্যাপকের কাজ সম্পর্কে নন্দিনী জানিয়েছিল "দিন-রাত পুঁথির মধ্যে গর্ত খুঁড়ে চলা।" অধ্যাপক কিছু সময়ের জন্য সেই কাজে বিরতি দিয়ে নন্দিনীকে নিয়ে সময় কাটাতে চান। নন্দিনীকে নিয়ে এই ব্যক্তিগত সময়ে তাঁর যে কাজ বাহ্যদৃষ্টিতে তা ব্যবহারিক-প্রয়োজনের কাজ নয়— তা অপ্রয়োজনের কাজ বা অকাজের কাজ। ব্যবহারিক জীবনে তার কোনো গুরুত্ব বা কার্যকর ভূমিকা নেই। কিন্তু আমাদের মনোজীবনে আছে তার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। আমাদের বেঁচে থাকার জন্য তথাকথিত এই অকাজের প্রয়োজন যে কত গুরুত্বপূর্ণ তার স্বীকৃতি আছে প্রাচীন গুহাচিত্র থেকে আধুনিক শিল্প-সাহিত্যের ইতিহাসে। আলতামিরার গুহায় গুহামানবের আঁকা টাঁড়বারো, বা ভীমবেটকার গুহায় গুহামানবের আঁকা নৃত্যরতা নারী থেকে একালের হুয়ান রামোন হিমেনেথের Naked Poetry, বা রবার্ট রোশেনবার্গের 'White Painting'-এ ছড়িয়ে আছে তার অজস্র দৃষ্টান্ত। যক্ষপুরী কাজের জায়গা। এখানে সবাই ধানের গায়ে তুঁষের মতো "দরকারের গায়ে আঁট করে লাগানো"। অথচ সে-অর্থে নন্দিনী কোনো কাজ করে না। চন্দ্রা নন্দিনীর কাজের কথা জানিয়ে বলে — সে "অষ্টপ্রহর কেবল সুন্দরীপনা করে বেড়ায়", আর "কেবল সবার মন ভুলিয়ে ভুলিয়ে ঘুরে" বেড়ায়। এ-সব কাজের সঙ্গে ব্যবহারিক প্রয়োজনের কোনো যোগ নেই। গোকুলের তাই বিস্ময়-মিশ্রিত জিজ্ঞাসা - "এখানকার রাজা খামকা ওকে আনালে কেন?" সে প্রশ্ন করে- "এখানে তোমাকে রাজা কোন্ কাজের প্রয়োজনে এনেছে?" উত্তরে নন্দিনী বলে- "অকাজের প্রয়োজনে"। কবির 'চিত্রা' কাব্যের 'আবেদন' কবিতায় রাণীর প্রশ্নের উত্তরে ভৃত্য জানিয়েছিল সে কেবল 'অকাজের কাজ'[১১]-এরই উপযুক্ত। এই উত্তরে সন্তুষ্ট রাণী স্নেহপরবশ হয়ে তাকে বলেছিলেন — "তুই মোর মালঞ্চের হবি মালাকর।"[১২] আসলে কাজের সঙ্গে যোগ প্রয়োজনের - আর, আনন্দের সঙ্গে যোগ অপ্রয়োজনের। কাজ আমাদের টিকে থাকতে সাহায্য করে। কিন্তু অকাজ আমাদের সাহায্য করে বেঁচে থাকতে। রক্তকরবীর রাজা ব্যাঙকে দেখে বুঝেছিল কাকে বলে টিকে থাকা, আর কাকে বলে বেঁচে থাকা।

ব্যক্তিগত সময় বা personal time-এর ধারণা থেকে বোঝা যায় যে, সকলের কাছে সময়ের রূপ একরকম নয়। সময় আপেক্ষিক। আইনস্টাইনও তাঁর 'Theory of Relativity'-তে (১৯০৫) সময়ের এই আপেক্ষিকতার কথা জানিয়েছিলে আমাদের। কবির 'ডাকঘর'-এর অমলের উক্তিতেও আছে সময়ের এই আপেক্ষিকতার প্রকাশ। প্রহরীকে সে কিছুটা বিস্মিত হয়ে বলে — "কেউ বলে সময় বয়ে যাচ্ছে, কেউ বলে সময় হয় নি"।[১৩] 'রক্তকরবী'-তে নন্দিনী ও রাজার প্রথম কথোপকথনে দেখি — নন্দিনী যখন 'খুশি নিয়ে' রাজার ঘরে যেতে চায়, অর্থাৎ নন্দিনীর যখন সময় আছে, তখন রাজা বলে "আমার সময় নেই, একটুও না।"

কিন্তু রাজার এই 'সময় নেই' মুহূর্তেই পরিবর্তিত হয়ে যায় 'সময় আছে'-তে। রাজা মুহূর্তেই 'না' থেকে পৌঁছে যায় হাঁ-তে। রাজা ও নন্দিনীর প্রথম কথোপকথনে দেখি নন্দিনী বারবার রাজাকে অনুরোধ করে তার (রাজার) ঘরে যেতে দেওয়ার জন্য। কিন্তু রাজা বারবার সে আবেদন প্রত্যাখ্যান করে সময় না-থাকার কারণ দেখিয়ে:

© 2026 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2026.28.00.25

১. কিন্তু বারে বারে ডেকো না, আমার সময় নেই, একটুও না।

২. আসতে দেব না, কী বলবে শীঘ্র বলো। সময় নেই।

৩. যাও যাও, আর কথা কোয়ো না, সময় নেই।

কিন্তু যেই-না রাজা রঞ্জনের সঙ্গে প্রতিতুলনায় নন্দিনীর মনে নিজের অবস্থান বুঝে নিতে চায় অমনি রাজার সময়হীনতা পলকের মধ্যে সময়ঋদ্ধ হয়ে ওঠে। রঞ্জন এখানে সেই reagent যে মুহূর্তে বদলে দেয় রাজার মনের সমীকরণ। রাজা ও নন্দিনীর প্রাসঙ্গিক কয়েকটি সংলাপ আছে এভাবে:

নেপথ্যে। আচ্ছা নন্দিনী, আমাকে কী মনে কর, খুলে বলো তো।

নন্দিনী। সে আর-একদিন বলব। আজ তো তোমার সময় নেই, আজ যাই।

নেপথ্যে। না, না, যেয়ো না, বলে যাও। আমাকে কী মনে কর বলো।

নন্দিনী। কতবার বলেছি, তোমাকে মনে করি আশ্চর্য। দেখে আমার মন নাচে।

নেপথ্যে। রঞ্জনকে দেখে তোমার মন যে নাচে সেও কি—

নন্দিনী। সে কথা থাক্, তোমার তো সময় নেই।

মুহূর্তে রাজা বলে ওঠে — 'আছে সময়'। যা ছিল 'নেই' পলকেই তা রূপান্তরিত হয়ে যায় 'আছে' তে। এ হল metamorphosis of time। এর নেপথ্যে আছে রাজার মনস্তাত্ত্বিক ক্রিয়া। রাজা ঈর্ষা করে রঞ্জনকে। রঞ্জনের সঙ্গে প্রতিতুলনায় ভিতরে-ভিতরে নিজের হার টের পায় রাজা। এবং হারের কারণও তার অজানা নয়। তাই সে নন্দিনীকে বলে — "রঞ্জনের মতো যৌবন থাকলে ছাড়া রেখেই তোমাকে বাঁধতে পারতুম।" অপগত-যৌবন-রাজা বুঝতে পারে তার সময় গেছে। কিন্তু সময়-যাওয়াও যে সময়-থাকা হয়ে উঠতে পারে তো ধরা পড়ে নি তার প্রজ্ঞায়। তাই রাজা তার স্রষ্টার মতো বলতে পারে না "সময় আমার গেছে বলেই সময় থাকে পড়ে।"[১৪] যে-সময় গেছে তা সসীম, আর যে-সময় পড়ে আছে তা অসীম। রাজা সসীম সময়ের কারবারী। ঘণ্টা- মিনিট-দিন-মাস-বছরকে ঘিরে তার পরিক্রমা। তাই সময়-যাওয়ার বেদনা তাকে কুরে কুরে খায়। এবং সেজন্যে রঞ্জনের প্রতি ঈর্ষাই বদলে দেয় রাজার objective সময়ের রং।

নন্দিনীর সঙ্গে রাজার দ্বিতীয় পর্বের কথোপকথনেও আছে সময়কে কেন্দ্র করে রাজার একই ধরনের অনুভব। এখানে যে-রাজা নন্দিনীকে বলে — "যাও তুমি, সময় নষ্ট কোরো না", সেই রাজাই পরমুহূর্তে বলে — "না না, একটু রোসো"। এখানেও ঘটে যায় সময়ের metamorphosis। কিশোর বা অধ্যাপকের মতো রাজাও বিশ্বগত সময়কে পরিবর্তিত করে নিতে চায় ব্যক্তিগত সময়ে। এদের সবার ক্ষেত্রেই সময়ের এই পরিবর্তনের নেপথ্য-কারণ

© 2026 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

Volume 28 : 2025-2026
Journal of Philosophy and the Life-world
DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2026.28.00.25

নন্দিনী। অ্যারিস্টটল বলেছিলেন সময়ের যোগে বস্তুর পরিবর্তন ঘটে। এখানে দেখি — বস্তুর (অর্থাৎ নন্দিনীর) যোগেই পরিবর্তন ঘটে যায় সময়ের।

প্রসঙ্গত এক ভিন্নতর ভাবনার কথাও মনে হয় আমাদের। একে কি আমরা সত্যিই বলবো metamorphosis? নাকি সময়ের এই মনস্তাত্ত্বিক আলোচনায় আমরা একথাও ভাবতে পারি যে— যাকে আমরা metamorphosis of time বলছি তা আসলে কোনো metamorphosis নয়। 'নেই' এবং 'আছে'— এ-দুইয়েরই মূর্তি যেন অভিন্ন। রূপে এরা পৃথক হলেও স্বরূপত এক। বাইরে যা নেই 'ভিতরে' তা-ই 'আছে'। বাইরের এই 'নেই' আসলে প্রেম-মনস্তত্ত্বের সেই বাধা যে-বাধা দিয়ে সাধারণত প্রেমিকা বা প্রেমিক বুঝে নিতে চায় প্রেমিক বা প্রেমিকার আগ্রহ, আন্তরিকতা ও বিশ্বস্ততার মাত্রা। এই বুঝে নিতে চাওয়ার ইচ্ছের নেপথ্যে অবশ্যই সক্রিয় থাকে ভালোলাগার বোধ। বাধা তখন হয়ে দাঁড়ায় কাছে টানার নামান্তর। প্রত্যাখ্যান তখন আমন্ত্রণের প্রতিশব্দ বা সমার্থক শব্দ। এই বাধার ভিতর দিয়েই যে প্রেমের সৌন্দর্য উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে সে-কথা কবি আমাদের জানিয়েছেন তাঁর 'শেষের কবিতা' উপন্যাসে। ছন্দের বাধায় যেমন কবিতার সৌন্দর্য, ইচ্ছাকৃত বাধাতেই তেমনি প্রেমের সৌন্দর্য। কবি একে বলেছিলেন প্রেমের আর্ট। 'রক্তকরবী'-তে রাজার বারবার 'সময় নেই'-এর কথা বলাও সেই ইচ্ছাকৃত বাধা — যা আসলে প্রেমের আর্ট। রাজার এই 'সময় নেই'-এর কথা যে সত্য নয় তা বোঝা যায় মুহূর্ত-পরেই তার 'সময় আছে' — এই উক্তি থেকে। দার্শনিক যুক্তির বিচারে, কিংবা তর্কশাস্ত্রের সাধারণ নিয়মে নাস্তির থেকে আস্তির উদ্ভব অসম্ভব। তাই 'নেই' থেকে 'আছে-র সৃষ্টি হতে পারে না কিছুতেই। সেজন্যেই আমাদের ভাবতে হয়, রাজার 'সময় নেই' আসলে 'সময় আছে'-রই ভিন্নতর প্রকাশ। দর্পণে বস্তুর প্রতিবিম্ব উল্টো হয়ে দেখা দেয়। ডান হাতকে দেখায় বাম হাত, বা বাম হাতকে দেখায় ডান হাত। রাজার হৃদয়-দর্পণে দেখলে 'সময় নেই'-কেই দেখায় 'সময় আছে' রূপে।

রক্তকরবী নাটকে আছে সময়ের এক surrealistic চলন। Surrealistic চলনে বৃহৎকাল কখনো ধরা দেয় সীমিত কালে, আবার সীমিত কাল কখনো প্রসারিত হয়ে যায় অন্তহীন কালে। চণ্ডীদাসের রাধার কাছে নিমেষই হয়ে উঠেছিল যুগ — "নিমিখে মানয়ে যুগ কোরে দূর মানি"। আর রবীন্দ্রনাথের 'একরাত্রি' গল্পে সেকেন্ড মাস্টারের অনুভবে অনন্ত ধরা দিয়েছিল মুহূর্তের সীমায় — "আমার সমস্ত ইহজীবনে কেবল ক্ষণকালের জন্য একটি অনন্তরাত্রির উদয় হইয়াছিল"।[১৫] কবির 'রাজা' নাটকের রাজাও "কত যুগের ধ্যান, কত আকাশের আবেগ, কত ঋতুর উপহার"[১৬] -কে সংহতরূপে দেখতে পেয়েছিল রাণী সুদর্শনার রূপের সীমায়। কবি নিজেও তাঁর 'ছিন্নপত্র'-এর চিঠিতে বৈষ্ণব কবি বসন্ত রায়ের "নিমিষে শতেক যুগ হারাই হেন বাসি" পংক্তিটির অনুষঙ্গে বলেছিলেন — "বাস্তবিক, মানুষের এক নিমেষের মধ্যে শত যুগেরই সংযোগ-বিয়োগ তো ঘটে"।[১৭] 'রক্তকরবী'-র রাজাও ব্যাঙের জীবনের সীমিত কালের আয়তনে উপলব্ধি করে তিন হাজার বছরের কালসীমাকে। রাজা একটা মরা ব্যাঙ হাতে নিয়ে নন্দিনীকে বলে:

© 2026 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

Volume 28 : 2025-2026
Journal of Philosophy and the Life-world
DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2026.28.00.25

> এই ব্যাঙ একদিন একটা পাথরের কোটরের মধ্যে ঢুকেছিল। তারই আড়ালে তিন হাজার বছর ছিল টিকে। এইভাবে কী করে টিকে থাকতে হয় তারই রহস্য ওর কাছ থেকে শিখছিলুম; কী করে বেঁচে থাকতে হয় তা ও জানে না।

ব্যাঙ যেমন টিকে থাকার প্রতীক তেমনি রূপান্তরেরও প্রতীক। শীতল রক্তের প্রাণী ব্যাঙ শীতের প্রতিকূল পরিবেশে টিকে থাকার জন্য শীতঘুমে (hibernation) যায়। এই সময় তারা স্বেচ্ছায় বিপাকীয় (metabolic) কার্যক্রম কমিয়ে দেয়। এবং তাদের হৃৎস্পন্দন ও শ্বাস-প্রশ্বাসও কমে যায়। ফলে তাদের শক্তি সাশ্রয় হয় যথেষ্ট। তাছাড়া ব্যাঙের ক্ষেত্রে শারীরিক রূপান্তরও ঘটে। ব্যাঙাচি অবস্থায় তাদের লেজ থাকলেও পরে তা থাকে না। ব্যাঙের বাসস্থানেরও পরিবর্তন ঘটে। তাদের প্রথম জীবন জলে কাটলেও পরবর্তীকালে স্থলভূমি হয়ে ওঠে তাদের আবাসস্থল। রাজা নিজের জীবনেও এই রূপান্তর বা পরিবর্তনের প্রত্যাশী। সে টিকে-থাকার থেকে বেঁচে-থাকায় পৌঁছোতে চায়। ভিতরে ভিতরে তপ্ত, রিক্ত ও ক্লান্ত রাজা সবুজ ঘাসের স্পর্শে সঞ্জীবিত হয়ে উঠতে চায়। তখন দীর্ঘকালীন টিকে থাকার থেকে স্বল্পকালীন বেঁচে-থাকাও তার কাছে অভিপ্রেত মনে হয়। জীবনানন্দের কবিতাতেও আমরা দেখি ব্যাঙের এই টিকে থাকার আকাঙ্ক্ষা। জরাজীর্ণ হয়েও তা টিকে-থাকার আকুতি জানায় —

> গলিত স্থবির ব্যাঙ
> আরও দুই-মুহূর্তের ভিক্ষা মাগে।[১৮]

রক্তকরবীর রাজা যে ব্যাঙের তিন হাজার বছর টিকে থাকার কথা বলে তা বাস্তবে অসম্ভব। ব্যাঙের জীবৎকাল সাধারণত দু থেকে দশ বছর। জীববিজ্ঞানীরা অবশ্য আমাদের জানান যে — দু-একটি ব্যতিক্রমী প্রজাতির ব্যাঙ সর্বোচ্চ কুড়ি বছর পর্যন্ত বাঁচে। তাহলে রাজা কেন বলে তিন হাজার বছরের কথা? আসলে তিন হাজার বছর দিয়ে বোঝানো হয়েছে ইতিহাসের ওপারকার কাল (প্রত্নকাল) বা ব্যাপ্ত মহাকালকে। ব্যাঙের জীবনের খন্ড কালসীমায় রাজা ধরতে চায় অসীম মহাকালকে। সীমা ব্যতীত অসীমের প্রকাশ সম্ভব নয়। তাই ধারণাকাল বা conceptual time-এর সাহায্যেই ধরতে হয় ধারণাতীত কাল বা non-conceptual time-কে। ব্যাঙের জীবনের খণ্ডকালই যেন প্রবাহিত হয়ে যায় মহাকালে; অনেকটা নদী যেমন প্রবাহিত হয়ে গিয়ে মেশে মহাসমুদ্রে। অর্থাৎ সময় এখানে তরল ও প্রবহনশীল। গ্রীক দার্শনিক হিরাক্লিটাসও সময়কে দেখেছিলেন নদীর উপমায় — অর্থাৎ তরল এক প্রবাহ হিসেবে। বৌদ্ধদর্শনেও সময়কে প্রবহমান (flux) ও ক্ষণস্থায়ী (transient) বলে মনে করা হয়েছে। প্রসঙ্গত আমাদের মনে পড়ে, স্পেনের বিখ্যাত surrealist চিত্রশিল্পী সালভাদোর দালির Melting clocks-এর কথা। অর্ধতরল ঘড়ির প্রতীকে সময় সেখানে নমনীয় (flexible) ও তরল (Liquid)। সময়কে যেন এখানে ইচ্ছেমতো বাঁকিয়ে-চুরিয়ে নেওয়া যায়, কিংবা তাকে প্রবাহিত করানো যায় ইচ্ছেমতো দিকে। সময়ের এই তরলিত রূপ আমাদের বুঝিয়ে দেয় সময়কে আমরা objective-ভাবে বুঝতে অভ্যস্ত হলেও

© 2026 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

সময় আসলে subjective। তার সঙ্গে যোগ আমাদের আবেগ, অনুভূতি, আকাঙ্ক্ষা ও অভিজ্ঞতা প্রভৃতির। তা যত-না সচেতন মনের, তার থেকে অনেক বেশি অবচেতনের। সময় আমাদের এও বুঝিয়ে দেয় যে — সময়ের গতি সবসময় সরলরৈখিক (Linear) নয়। অর্থাৎ তা কেবলই অতীত থেকে বর্তমান, বর্তমান থেকে ভবিষ্যতে প্রবাহিত হয় না। তার গতি যেমন হতে পারে অতীত থেকে বর্তমানে, তেমনি হতে পারে বর্তমান থেকে অতীতেও। তবে বর্তমান থেকে অতীত হল স্মৃতির বিষয়। বিজ্ঞান সময়ের কেবল সম্মুখগতিকেই (forward movement) স্বীকার করে (Time machine-এর ধারণা অন্য বিষয়)। প্রাচীন হেরাক্লিটাস থেকে আধুনিক বার্গসঁর মতো অনেক দার্শনিকই সময়ের এই সম্মুখগতিকে একমাত্র বলে মনে করেছেন। রবীন্দ্রনাথও কখনও-কখনও(সবসময় নয়) এভাবে ভেবেছেন। এর দৃষ্টান্ত আছে তাঁর 'বলাকা' কাব্যের ৮ সংখ্যক কবিতায়। সেখানে কবি সময়কে দেখেছেন নদীর — অর্থাৎ প্রবাহিত তরলের প্রতীকে। এবং এই নদীর উদ্দেশে বলেছেন:

শুধু ধাও, শুধু ধাও, শুধু বেগে ধাও
উদ্দাম উধাও;
ফিরে নাহি চাও—[১৯]

অর্থাৎ, এখানে কবির ধারণায় সময়ের গতি কেবলমাত্র সম্মুখের দিকে। কেন না, নদী কখনো পেছনে ফেরে না। উৎস থেকে তার যাত্রা কেবলই সামনের দিকে। তবে সময়ের গতি সম্পর্কে একটি কৌতূহলোদ্দীপক বিষয় হল- এর গতিবেগ সম্পর্কে কোনো ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। এর বেগের লয় সম্পর্কে একটা অনির্দিষ্ট ধারণা পাওয়া যায় relativity of time থেকে। উত্তপ্ত কটাহের উপর থাকতে বাধ্য-করা বেড়ালের কাছে মুহূর্তকে মনে হয় অনন্ত। আবার প্রেমিক-প্রেমিকার সান্নিধ্যের দীর্ঘ সময়কেও মনে হয় ক্ষণিক। অথচ নদীর জলপ্রবাহের গতিবেগ জানা যায় সুনির্দিষ্ট গাণিতিক হিসেবের মাধ্যমেই। যাই হোক্, এই প্রবহমান বা গতিশীল সময় আবার আমাদের অনুভূতিতে স্থির হয়েও থাকতে পারে। এলিয়ট তাঁর ‘Four Quartets’ কাব্যের ‘Burnt Norton’-এ সচল জীবনপ্রবাহের মধ্যে সময়ের এমনি এক স্থির অবস্থা বা ‘still point’ এর কথা বলেন — যা একইসঙ্গে অক্রিয় (inert) ও সক্রিয়, যেখানে একই সঙ্গে মিলে যায় অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কাল। কবির উক্তিতে:

And do not call it fixity,
Where past and future are
gathered. Neither movement
from nor towards,
Neither ascent nor decline.
Except for the point, the still

Volume 28 : 2025-2026
Journal of Philosophy and the Life-world
DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2026.28.00.25

point,
There would be no dance, and
there is only the dance.[২০]

আমাদের সুধীন্দ্রনাথ দত্তের ‘শাশ্বতী’ কবিতাতেও প্রেমিক-পুরুষ তার অনুভূতির সান্দ্রতায় উচ্চারণ করে এক স্থির সময়ের কথা:

একটি নিমেষ দাঁড়াল সরণী জুড়ে,
থামিল কালের চিরচঞ্চল গতি।[২১]

আর, রবীন্দ্রনাথের ‘শিশু ভোলানাথ’ কাব্যের ‘সময়হারা’ কবিতার শিশুটিও ভেবেছিল এমনি এক স্তব্ধ সময়ের কথা। তার ইচ্ছের কাছে যেন হার মানে সময়। ঘড়ির কাঁটার চলা বন্ধ হয়ে যায় দশটা বাজার আগে। তাই দশটা আর বাজবে না কখনো। ফলে শিশুটিকেও আর স্কুলে যেতে হবে না।শিশুটি তার মাকে তাই বলে:

তখন স্কুলে নাই বা গেলেম;
কেউ যদি কয় মন্দ,
আমি বলব, "দশটা বাজাই বন্ধ"।

... ...

ন'টা বাজাই থামল যখন, কেমন করে শুই?
দেরি বলে নেই তো মা কিচ্ছুই।[২২]

দেরী-হওয়া বিষয়টি সময়ের চলনশীলতার সঙ্গে সম্পর্কিত।কিন্তু সময় স্থির বা অ-চল হয়ে থাকলে দেরি কথাটির কোনো অর্থই থাকে না। যে-সময়ের যোগে বিশ্বের সবকিছুর পরিবর্তন ঘটে সেই সময় স্থির হয়ে থাকলে পরিবর্তন বলেও আর কিছু থাকে না।

প্রসঙ্গত বলা যায়, সময়ের স্তব্ধতার ধারণা শুধু মনস্তাত্ত্বিক বিষয় নয় — আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানও একভাবে স্বীকার করে এর কথা। আইনস্টাইন তাঁর ‘Special Theory of Relativity’-তে যে Time dilation-এর কথা জানিয়েছিলেন, তার অনুসিদ্ধান্ত হিসেবেই পাওয়া যায় সময়ের স্তব্ধতার ধারণা। Time dilation-এর তত্ত্ব অনুসারে কোনো স্থিরবিন্দুতে দাঁড়ানো ব্যক্তির ঘড়ির তুলনায় গতিশীল ব্যক্তির ঘড়ি slow যাবে। গতি যত উচ্চ হবে ঘড়িও সেই পরিমাণে slow যাবে। এই সূত্রেই, যদি কল্পনা করা যায় যে, কোনো ব্যক্তি আলোর কণায় চড়ে সূর্য থেকে পৃথিবীতে আসছেন তাহলে তাঁর ঘড়ির সময়ের কোনো পরিবর্তন হবে না — অর্থাৎ ঘড়িতে সময় স্থির হয়ে থাকবে। অর্থাৎ তিনি পৃথিবীতে আসবেন বিনা সময়ে। অথচ পৃথিবীতে থাকা স্থির পর্যবেক্ষকের ঘড়ি সময় দেখাবে আট মিনিট কুড়ি সেকেন্ড — কেন না, সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্ব

© 2026 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

Volume 28 : 2025-2026
Journal of Philosophy and the Life-world
DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2026.28.00.25

অতিক্রম করতে আলোর সময় লাগে এই আট মিনিট কুড়ি সেকেন্ড।

রক্তকরবী নাটকে বিশুর গানেও ধরা পড়েছে সময়ের তরলিত রূপের প্রকাশ। নন্দিনীর অনুরোধে বিশু যে 'পথ চাওয়ার গান' গায় তাতে সে বলে:

যুগে যুগে বুঝি আমায় চেয়েছিল সে।
সেই বুঝি মোর পথের ধারে রয়েছে বসে।
আজ কেন মোর পড়ে মনে
কখন তারে চোখের কোণে
দেখেছিলেম অফুট প্রদোষে
সেই মেন মোর পথের ধারে রয়েছে বসে।

নন্দিনীর অনুরোধেই এ-গান গেয়েছে বিশু। বাইরের দিক থেকে এ-গানে রঞ্জনের উদ্দেশে নন্দিনীর মনের কথা ব্যক্ত হলেও আসলে এ-গানে বিশু তারই মনের কথা ব্যক্ত করেছে নন্দিনীর উদ্দেশে। যুগ-যুগ ধরে সে-ই পথের ধারে অপেক্ষা করে আছে নন্দিনীকে পাওয়ার জন্যে। তার না-পাওয়ার বেদনাই জমে জমে পাথর হয়ে আছে তার গানের বাণীতে।

এই গানে উল্লিখিত অতীতের 'যুগ-যুগ' যেন অনায়াসে গড়িয়ে বর্তমান আসে 'আজ' বা বর্তমানে। কিংবা বর্তমান গিয়ে যেন স্পর্শ করে দূর-অতীতের যুগ-যুগকে। সম্ভবত বিশু তার এই 'যুগে-যুগে' শব্দবন্ধের উল্লেখে Cosmic Time-এর কথাই বলতে চায়। ভারতীয় কাল-চেতনায় Cosmic Time হল ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির সূচনা থেকে প্রবাহিত হয়ে আসা এক অন্তহীন কাল বা Great Time — যেখানে যুগ, মহাযুগ, বা কল্প-কল্পান্তকেও মনে হয় বিন্দুবৎ।

ভারতীয় পুরাণ অনুসারে এই Cosmic Time-এর কাল-পরিমাণ অত্যন্ত ব্যাপক। পুরাণোক্ত সময়ের হিসেবে চার যুগে হয় এক মহাযুগ। এই চার যুগ হল — সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি। সব মহাযুগেই পরপর আসে এই চার যুগ। তবে সব যুগের কাল-পরিমাণ এক নয়। সত্যযুগের কাল-পরিমাণ ৪০০০ বছর, ত্রেতা যুগের ৩০০০ বছর, দ্বাপর যুগের ২০০০ বছর, এবং কলিযুগের ১০০০ বছর। এ-ছাড়া প্রত্যেক যুগেরই থাকে সূচনা ও সমাপ্তি কাল। প্রত্যেক যুগের সমাপ্তি হয় প্রলয় বা ধ্বংসের মধ্য দিয়ে। তারপর হয় অন্য যুগের সূচনা বা সৃষ্টি। চার যুগের এই সূচনা ও সমাপ্তি কালের মোট পরিমাণ ২০০০ বছর। অর্থাৎ, এক মহাযুগের সর্বমোট কাল-পরিমাণ ১২০০০ বছর। এরকম ১০০০ মহাযুগে হয় এক কল্প। এবং ১৪ কল্পে হয় এক মন্বন্তর। এক কল্পে ব্রহ্মার হয় একদিন ও এক কল্পে তাঁর হয় এক রাত্রি। অর্থাৎ দুই কল্প মিলিয়ে ব্রহ্মার এক অহোরাত্র। এই হিসেবে ব্রহ্মার স্থিতিকাল হল ২৫,৬০,০০০ মহাযুগ বা তিন হাজার বাহাত্তর কোটি বছর। ভারতীয় কাল-দর্শনে Cosmic Time-ই হল Real। মানুষের হিসেবভুক্ত কাল হল Unreal বা মায়া।

© 2026 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

বিশু তার গানে 'যুগে-যুগে'-র উল্লেখে বলতে চায় — সূচনাকাল থেকেই সে অপেক্ষা করে আছে তার মানসী-প্রেয়সীর জন্যে। 'মানসী' কাব্যের 'অনন্ত প্রেম' কবিতার প্রেমিক-পুরুষের মতো সে-ও যেন বলে:

> তোমারেই যেন ভালোবাসিয়াছি
> শত রূপে শতবার
> জনমে জনমে, যুগে যুগে অনিবার।[২৩]

এবং তখন বিশু ও তার মানসী তাদের কালিক নির্দিষ্টতাকে অতিক্রম করে হয়ে ওঠে দুই চিরন্তন সত্তা — দেশভেদে, কালভেদে যাদের নাম কখনো মনু ও শ্রদ্ধা, কখনো আদম ও ইভ, কখনো গায়া ও ইউরেনাস, আবার কখনো বা পিলচু হাড়াম ও পিলচু বুড়ি প্রভৃতি। তাদের সঙ্গে যোগ একইসঙ্গে একালের ও অনন্তকালের — Historical Time ও Cosmic Time-এর। যুগের পর যুগ সৃষ্টি ও ধ্বংসের ক্রমিক আবর্তনের ভিতর দিয়ে চলতে চলতে বিশু যেন তার চিরন্তন মানসীর উদ্দেশে গাইতে থাকে এই পথ-চাওয়ার বা প্রতীক্ষার গান — বলতে থাকে 'Amo ergo sum'[২৪]।

বিশুর এই 'যুগে-যুগে' শব্দবন্ধের অনুষঙ্গে তার পথও — যে পথের ধারে বসে সে গান গায় — চলে আসে ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির সূচনাকাল থেকে একাল পর্যন্ত। সান্ত পথই তখন হয়ে ওঠে অন্তহীন পথ। অর্থাৎ time-এর সঙ্গে সঙ্গে space-ও হয়ে ওঠে subjective তথা surrealistic। তাই পৃথিবীর কোনো মানচিত্রেই এ-পথের কোনো সন্ধান পাওয়া যাবে না। বিশ্বের কোনো ভূগোল-বিবরণেই পাওয়া যাবে না এর কোনো পরিচয় বা বর্ণনা। এ-পথের একমাত্র অবস্থান বিশুর গোপন আকাঙ্ক্ষায়। যুগের পর যুগ পার হয়ে, আশা-নৈরাশ্যের আলো-অন্ধকার ছুঁয়ে-ছুঁয়ে বিশুর এ পথ তার বুকের ভিতর দিয়ে-দিয়ে কেবলই চলে যায় তার স্মৃতি থেকে কল্পনার দেশে — অনুরাগ থেকে ভাবসম্মিলনের দেশে।

বিশু যে 'যুগে-যুগে' বলতে Cosmic Time-কেই ইঙ্গিত করে তা আর একভাবে বোঝা যায় গানে ব্যবহৃত তার ' অফুট প্রদোষে' কথাটি থেকে। প্রদোষ হল রজনীর আরম্ভকাল বা সন্ধ্যাকাল। ভারতীয় পুরাণ অনুসারে প্রত্যেক যুগের সমাপ্তিতেই থাকে আধো-আলো আধো-অন্ধকারে ঢাকা এক প্রদোষকাল। যুগের এই প্রদোষকাল সম্পর্কে ভারতীয় পুরাণ-বিশেষজ্ঞ মির্চা এলিয়াদ তাঁর 'Images And Symbols' গ্রন্থের 'Indian Symbolism Of Time And Eternity' অধ্যায়ে বলেন:

> The passage from one *yuga* to another takes place during a twilight interval, which maxes a decline even within each *yuga*, every one of

© 2026 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

> them terminating in a phase of darkness.[২৫]

আলোয় নয়, যুগান্তের এই অফুট প্রদোষেই আলো-অন্ধকারের রহস্যময়তায় বিশু প্রথম দেখেছিল তার মানসীকে। আজ তাকে সে দেখতে চায় আলোর পূর্ণতায়। তাই 'আলোর সংগীতে' তাকে 'বরণ' করে নেওয়ার জন্যেই বিশুর গীতিময় আকাঙ্ক্ষা:

> আজ এই চাঁদের বরণ হবে আলোর সংগীতে,
>
> রাতের মুখের আঁধারখানি খুলবে ইঙ্গিতে।

রক্তকরবী নাটকে আমরা আর একবার এই Cosmic Time- এর ইঙ্গিত পাই নন্দিনীর সংলাপে। ধ্বজাপূজার জন্যে রাজা অত্যন্ত ব্যস্ত। তাই তার ঘরের মধ্যে নন্দিনীকে যেতে দিতে চায় না সে। নন্দিনীকে ক্ষুব্ধ হয়ে সে বলে- "পুজোয় যাবার সময় দরজায় দাঁড়িয়ে থেকো না। বিপদ ঘটবে।" উত্তরে নন্দিনী বলে:

> "দেবতার সময়ের অভাব নেই, পুজোর জন্য যুগ-যুগান্তর অপেক্ষা করতে পারেন। মানুষের দুঃখ মানুষের নাগাল চায় যে। তার সময় অল্প।"

দেবতারা সর্বকালে বিরাজ করেন বলেই তাঁদের কালের হিসেব Cosmic Time-এর অনুসারী। অর্থাৎ, এক অর্থে তাঁদের সময় অনন্ত। কিন্তু মানুষের সময় তার স্বল্প জীবৎকালের সীমায় আবদ্ধ। সে নিজেকে মাপে ঘড়ির ঘন্টা, মিনিট, সেকেন্ডের এককে। অন্যদিকে, মানুষের এক বর্ষে দেবতাদের এক অহোরাত্র। উত্তরায়ণ হল তাঁদের দিন ও দক্ষিণায়ন হল রাত্রি। দেবতাদের এরকম ৩৬০ অহোরাত্রে এক দিব্যবর্ষ (Divine year)। দ্বাদশ সহস্র দিব্যবর্ষে এক দৈবযুগ (Divine Age)। তাই দেবতাদের তুলনায় মানুষের সময় বিন্দুবৎ বললেও বেশি বলা হয়। দৈব সময় (Divine Time) ও মানবসময়ের (Human Time) এই পার্থক্যের কথাই নন্দিনী বলে রাজাকে। তবে মানুষের সময় অল্প বলেই যে তার দহনের যন্ত্রণা স্বল্প — তা নয়। বজ্রপাত হয় সেকেন্ডের ক্ষুদ্র ভগ্নাংশে — কিন্তু তার দাহিকা শক্তি ৩০ কোটি ভোল্ট থেকে ১০০ কোটি ভোল্ট।

রক্তকরবী নাটকে সময়ের চলন-সম্পর্ক শুধু অতীত ও বর্তমানের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। তার চলন-সম্পর্ক আছে বর্তমান ও ভবিষ্যতের মধ্যেও। রাজা নন্দিনীকে তার (রাজার) অনবকাশের মধ্যে ঘরে আনতে চায় না। সে অপেক্ষা করে থাকতে চায় ভবিষ্যতের জন্য। তাই রাজা নন্দিনীকে বলে:

> আমার অনবকাশের উজান ঠেলে তোমাকে ঘরে আনতে চাই নে। যেদিন পালের হাওয়ায় তুমি অনায়াসে আসবে সেই দিন আগমনীর লগ্ন লাগবে।

অথচ নন্দিনী যে রাজার ঘরে নিজে-থেকেই যেতে চায়, সে-ইচ্ছে সে বারবার প্রকাশ করেছে রাজার কাছে। এমনকী রাজার এই সংলাপের ঠিক আগেও সে রাজাকে বলেছে — "তুমি তো

© 2026 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

Volume 28 : 2025-2026
Journal of Philosophy and the Life-world
DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2026.28.00.25

আমাকে ঘরে যেতে দিলে না—।” যে-নন্দিনী বর্তমানেই যেতে চায় রাজায় ঘরে, রাজা সেই নন্দিনীরই ভবিষ্যতে আগমনের প্রত্যাশায় অপেক্ষা করে থাকতে চায়। এ হল বর্তমানকেই ভবিষ্যতে নূতন করে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা। সে-ভবিষ্যৎ কাল অনেকটা রাজার ইচ্ছার রঙেই রং করা — তার কল্পনায় গড়া। অর্থাৎ সময়ের যোগে নন্দিনীর পরিবর্তনের কথা ভাবে রাজা। কিন্তু ভবিষ্যৎ কালের কোনো প্রমাণ-সাপেক্ষ অস্তিত্ব নেই। Historical Time-এর থেকে তা একান্ত পৃথক। বস্তুত, তা সময়ের এক কাল্পনিক অবস্থা যার সঙ্গে যোগ ব্যক্তিগত আশা-আকাঙ্ক্ষার। তাই তা subjective time। এবং এর অভিমুখ যেহেতু নির্দিষ্ট — অর্থাৎ বর্তমান থেকে ভবিষ্যতের দিকে — তাই স্টিফেন হকিংয়ের ধারণানুসারে একে বলা যায় ‘Psychological Arrow of Time’।

বর্তমান থেকে সময়ের ভবিষ্যতের দিকে যাত্রার আর একটি উল্লেখ আছে নন্দিনীর উক্তিতে। রাজা ও নন্দিনীর কথোপকথনের শেষ পর্বে নন্দিনী যখন রাজার বিরুদ্ধে লড়াই করার ইচ্ছা প্রকাশ করে তখন রাজা বলে ওঠে — “তোমাকে যে এই মুহূর্তেই মেরে ফেলতে পারি।” উত্তরে নন্দিনী জানিয়ে দেয় — “তার পর থেকে মুহূর্তে মুহূর্তে আমার সেই মরা তোমাকে মারবে।” অর্থাৎ বর্তমান ‘মুহূর্ত’-ই তখন হয়ে যাবে ভবিষ্যতের অন্তহীন ‘মুহূর্ত’। সময়ের এ ভাবনা শুধু Extension of Time-কেই দ্যোতিত করে না — তা ‘Psychological Anrow of Time-কেও ইঙ্গিত করে। আবার একই সঙ্গে তা Psychological Time-ও — কেন না, ঘড়ি-মাপা Objective Time- এর সঙ্গে এর কোনো যোগ নেই। এ তার বিপরীত।

সরাসরি সময়কে কেন্দ্র করে রক্তকরবী নাটকে এক গুরুতর দার্শনিক সমস্যার অবতারণা আছে সর্দার ও পুরাণবাগীশের কথোপকথনে। সর্দার অবশ্য এখানে নিজের অভিমত নয়, রাজার অভিমতই প্রকাশ করে পুরাণবাগীশের কাছে। সর্দার বলে:

> রাজা বলে, পুরাণ বলে কিছু নেই। বর্তমান কালটাই কেবল বেড়ে বেড়ে চলেছে।

পুরাণ এখানে অতীতের স্মারক। অর্থাৎ তা বলে Historical Time-এর কথা। ভারতবর্ষে পুরাণের যে পাঁচটি লক্ষণের কথা আছে — অর্থাৎ সর্গ, প্রতিসর্গ, বংশ, মন্বন্তর ও বংশানুচরিত — তার সবগুলিই ইতিহাসের বিষয়। তা কখনো যুগের সৃষ্টি ও বিনাশের ইতিহাস, কখনো মনুর পরিবর্তনের ইতিহাস, আবার কখনো বা বংশ (dynasty) ও বংশানুচরিতের ইতিহাস। লেভি স্ট্রস তাঁর ‘Myth and Meaning’ বইয়ে ‘When Myth Becomes History’ অধ্যায়ে সরাসরি বলেছেন, ইতিহাস মিথকেই প্রতিস্থাপিত করেছে — বস্তুত উভয়ের কাজও হল এক:

> ... history has replaced mythology and fulfils the same function— ...[২৬]

© 2026 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

Volume 28 : 2025-2026
Journal of Philosophy and the Life-world
DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2026.28.00.25

এমনকী তাঁর ধারণায় — ইতিহাস হল "continuation of mythology"।[২৭] ডি.ডি.কোশাম্বির মতো তাত্ত্বিকরাও মিথকে বাস্তব-অভিজ্ঞতা-নির্ভর ইতিহাসের দিক থেকে বিচার করেছেন ('Myth and Reality' গ্রন্থে)। কিন্তু রাজা মনে করে — অতীত কাল বলে কিছু নেই। কালকে আমরা বুঝি ক্রিয়ার (activity) যোগে। যেহেতু বর্তমান কালে অতীতের কোনো ক্রিয়ারূপকে প্রত্যক্ষ করা সম্ভব নয় — তাই অতীতকাল বলে কিছু থাকতে পারে না। অর্থাৎ অতীতকাল হল এক ধরনের illusion। রাজার এ-ভাবনা আরও কিছুটা স্পষ্ট হয়ে আছে রক্তকরবী নাটকের প্রথম খসড়ায়। সেখানে রাজা সরাসরি পুরাণবাগীশকে প্রশ্ন করে — "পুরাণ! পুরাণ বলে কিছু আছে না কি?" উত্তরে পুরাণবাগীশ বলতে চান — "মহারাজ, পুরাতন কালে সে সব —" কিন্তু তাঁর কথা শেষ হওয়ার আগেই বিরক্ত হয়ে রাজা বলে ওঠে:

কালের কোন্ অংশ পুরাতন? যে কাল নিরবচ্ছিন্ন তুমি পণ্ডিত তাকে নূতন পুরাতনে ভাগ করবে? আমার মাথার উপরে ভাঙা তারিখের ভাঙা কাহিনীর শিলবৃষ্টি করতে এসেচ?

যে কাল নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহের মতো তাকে অতীতে বর্তমানে বা ভবিষ্যতে, কিংবা নূতনে ও পুরাতনে ভাগ করা যায় না। তার আদি বলেও কিছু নেই, অন্ত বলেও কিছু নেই। তাই সেখানে 'তারিখ' বা দিন-মাস-বছর বলেও কিছু নেই। এ-সবই মানুষ কৃত্রিমভাবে গড়ে নিয়েছে তার ব্যবহারিক সুবিধের জন্যে। যেমন সে কল্পনায় গড়ে নিয়েছে অক্ষাংশ বা দ্রাঘিমাংশ রেখা। পৃথিবীতে কোথাও এ-ধরনের কোনো রেখার অস্তিত্ব নেই। কিন্তু কোনো কিছুর স্থানিক অবস্থানকে চিহ্নিত করার জন্যে মানুষকে কল্পনা করে নিতে হয়েছে এই দুই রেখা। রাজার এই ধারণা সবটা না হলেও অনেকটা মিলে যায় দার্শনিক বার্গসঁর ধারণার সঙ্গে। বার্গসঁ তাঁর 'Creative Evolutions' গ্রন্থে সময় তথা সময়ের ধারণা প্রসঙ্গে বলেছিলেন:

> The actuality of our perception thus lies in its activity, in the movements which prolong it, and not in its greater intensity: past is only idea, the present is ideo-motor.[২৮]

বার্গসঁর এই কথা থেকে স্পষ্ট যে — অতীত কাল বলে কোনো কিছুর অস্তিত্ব তিনি স্বীকার করেন না। অতীত কাল তাঁর কাছে কেবল স্মৃতির বিষয়। বস্তুর স্মৃতি যেমন বস্তু হতে পারে না, তেমনি কালের স্মৃতিও কাল হতে পারে না।

শুধু অতীত নয়, বার্গসঁর ধারণায় বর্তমান কাল ছাড়া অন্য কোনো কাল নেই। তাঁর মতে, কাল শুধু ক্রিয়ার যোগেই উপলব্ধ হয়। আর, ক্রিয়া বা activity বর্তমানেই প্রত্যক্ষভাবে গোচরীভূত হয়। তাই বর্তমান কালই একমাত্র কাল। বার্গসঁর ব্যাখ্যায় বার্ট্রান্ড রাসেল তাই বলেন:

> if Bergson's account were correct, the present moment

© 2026 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

> ought to be the only one in the whole history of the world containing any activity.[২৯]

রাজাও এই সত্যকেই যথার্থ বলে মনে করে। সেও মনে করে কালের অভিধা শুধু বর্তমানেরই প্রাপ্য। তাই সে বলে — "বর্তমান কালটাই কেবল বেড়ে বেড়ে চলেছে।"

রাজার এই কথার উত্তরে পুরাণবাগীশ প্রতিযুক্তি হিসেবে বলেন:

> পুরাণ যদি নেই তাহলে কিছু আছে কী করে? পিছন যদি না থাকে তো সামনেটা কি থাকতে পারে?

পুরাণবাগীশের যুক্তি — জগতে কোনো কিছুই স্বয়ম্ভু নয়। অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্ব উদ্ভূত হতে পারে না। কিছু 'না-থাকলে' কিছু 'হওয়া' অসম্ভব। কিন্তু এই অস্তিত্ব-অনস্তিত্বের বিষয়টি — অর্থাৎ পূর্ববর্তিত্ব ও পরবর্তিত্বের বিষয়টি — সময়-সংক্রান্ত এক জটিল প্রশ্নে পৌঁছে দেয় আমাদের। এবং তা হল — সময়ের কি সূচনা বা beginning বলে কিছু আছে? যাঁরা সময়ের শাশ্বতত্বে (Eternity) বিশ্বাস করেন — বিশেষ করে ভাববাদী দার্শনিকরা — তাঁরা সময়ের কোনো সূচনাকালের তত্ত্বে বিশ্বাস করেন না। কান্ট ভিন্ন ধরণের ভাববাদী দার্শনিক — transcendental idealist — হলেও তিনিও কালের কোনো সূচনাবিন্দুকে স্বীকার করেন না। তাঁর মতে, কালের সূচনাবিন্দুকে স্বীকার করলে তার পূর্ববর্তী এক 'empty time' বা সময়-শূন্যতার কথা ভাবতে হয়। কিন্তু তা অবান্তর। তাঁর 'Critique of Pure Reason'-এ কান্ট এ-বিষয়ে বলেন:

> For let us assume that it has a beginning. Since the beginning is an existence which is preceded by a time in which the thing is not, there must have been a preceding time in which the world was not, i.e. an empty time. Now no coming to be a possible in an empty time, because no part of such a time possesses, as compared with any other, a distinguishing condition of existence non-existence; and this applies whether the thing is supposed to arise of itself or through some other cause.[৩০]

কালের সূচনা যদি থাকে তবে সেই সূচনা হল একটি ঘটনা। সমস্ত ঘটনাই সংঘটিত হয় কালে। সুতরাং সূচনা-ঘটনাও সংঘটিত হয় কালে। তাই স্বাভাবিকভাবেই সূচনা-ঘটনার পূর্বেও যে কালের অস্তিত্ব আছে তা স্বীকার করতে হয়। তা না হলে সূচনা-ঘটনা সংঘটিত হতে পারতো না। এই বিচারে, কালের সূচনা বলে কোনো কিছুকে নির্দিষ্ট করা বা চিহ্নিত করা যায় না। তবে স্টিফেন হকিংয়ের মতো বিজ্ঞানী অবশ্য Big-bang থেকেই সময়ের সূচনা বলে মনে

 © 2026 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

Volume 28 : 2025-2026
Journal of Philosophy and the Life-world
DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2026.28.00.25

করেন। কিন্তু Richard Swinburne কিংবা W. H. Newton-Smith-এর মতো একালের যুক্তিবাদী তাত্ত্বিকরাও সময়ের সূচনা হিসেবে কোনো নির্দিষ্ট বিন্দুর কথা অস্বীকার করেন। সুইনবার্ন তাঁর 'Space and Time' (1968) বইতে বললেন — সূচনারও থাকে সূচনা, আবার তারও থাকে সূচনা:

> Time.... is of logical necessity unbounded. Before every period of time which has at some instant a beginning, there must be another period of time, and so before any instant another instant.[৩১]

Newton-Smith-ও তাঁর 'The Beginning of Time' প্রবন্ধে শেষ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে – "So the prospects for ever being warranted in positing a beginning of time are dim"[৩২]। তাই পুরাণবাগীশের ধারণাকে স্বীকার করেই বলতে হয় — অতীত না থাকলে বর্তমানও থাকতে পারে না। পশ্চাৎ না থাকলে সম্মুখ বলে কোনো কিছু থাকা অসম্ভব। অর্থাৎ একটির সূত্রেই আসে অন্যটি। পুরাণবাগীশ আসলে দর্শন-বিজ্ঞানের কার্য-কারণ তত্ত্বের কথাই প্রকারন্তরে ব্যক্ত করেন এখানে। বর্তমান কাল হল কার্য — যার উদ্ভবের নেপথ্য-কারণ হল অতীতকাল। সাধারণভাবে কার্য-কারণের তত্ত্বকে স্বতঃসিদ্ধ বলে মনে করা হলেও দর্শনে-বিজ্ঞানে একে নিয়ে বিতর্ক নেই তা নয়। পুরাণবাগীশ ভুলে যান যে — পুরাণে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরকে স্বয়ম্ভূ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ এঁদের জন্মের কোনো নেপথ্য - কারণ বা উদ্ভব-ইতিহাস নেই। কিন্তু বৌদ্ধদর্শনের 'প্রতীত্যসমুৎপাদবাদ' কার্য-কারণের অনিবার্যতাকে গুরুত্বের সঙ্গে স্বীকার করে। তবে স্কটিশ দার্শনিক ডেভিড হিউম এই কার্য-কারণ তত্ত্বের বিরোধিতা করে বলেছিলেন — একে সর্বতোভাবে মান্য করার মতো কোনো সুদৃঢ় যুক্তি নেই। কান্ট, ব্রড, ইউয়িংয়ের মতো বুদ্ধিবাদী দার্শনিকরা কার্য-কারণ সম্পর্ককে সতত বা নিয়ত সম্পর্ক বলে মনে করলেও অভিজ্ঞতাবাদী হিউম তা অস্বীকার করেন। তাঁর মতে — কার্য-কারণ সম্পর্কের ধারণা অভিজ্ঞতা-নির্ভর বা অভ্যাসনির্ভর। কিংবা সে-সম্পর্কের ধারণার ভিত্তিভূমি আমাদের মনে। মেঘ করলে বৃষ্টি হয়। মেঘ ও বৃষ্টির মধ্যে এই কার্য-কারণ সম্পর্ক আমরা অভিজ্ঞতা থেকে লাভ করেছি। অভিজ্ঞতার সূত্রে এও জেনেছি যে — কারণ নিয়ত পূর্ববর্তী এবং কার্য নিয়ত পরবর্তী ঘটনা। অর্থাৎ, মেঘ-করা সবসময়ই পূর্ববর্তী ঘটনা, এবং বৃষ্টি হওয়া সবসময়ই পরবর্তী ঘটনা। কিন্তু মেঘ করলেই যে সবসময় বৃষ্টি হয় — এমন নয়। অর্থাৎ, মেঘ ও বৃষ্টির মধ্যে সম্পর্ককে — তথা কার্য-কারণ সম্পর্ককে — অনিবার্য সম্পর্ক বলা যায় না। হিউমের বক্তব্য — কারণ ও কার্য সম্পর্কে আমাদের ধারণা পৃথক পৃথক। এরা conjoined নয় — তবে connected। conjoined হলে এদের মধ্যে অনিবার্য সম্পর্ক থাকত। মেঘ- বৃষ্টির উদাহরণ দিয়ে বলা যায় — মেঘ ও বৃষ্টি সম্পর্কে আমাদের ধারণা পৃথক পৃথক। এবং মেঘ ও বৃষ্টি ওতপ্রোতভাবে সংলগ্ন (conjoined) নয় কিন্তু সংযুক্ত (connected)। তাই মেঘ করলে সাধারণত বৃষ্টি হয় — কিন্তু সবসময় মেঘ করলেই বৃষ্টি হয় না। যদি সম্পর্ক conjoined হত

© 2026 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2026.28.00.25

তাহলে মেঘ করলেই বৃষ্টি হত। সেজন্যেই হিউমের সিদ্ধান্ত — যাকে আমরা 'কারণ' বলি এবং যাকে আমরা 'কার্য' বলি তাদের সম্পর্কে আমাদের ইন্দ্রিয়নির্ভর অভিজ্ঞতায় থাকলেও স্বতন্ত্রভাবে তাদের মধ্যবর্তী কোনো সম্বন্ধের — কোনো অনিবার্য সম্বন্ধের — অভিজ্ঞতা আমাদের হয় না। তাই কার্য-কারণ সম্পর্ককে সর্বতোভাবে স্বীকার করা যায় না। হিউমের কথায়:

> that the simple view of any two objects or reactions, however related, can never give us any idea of power, or of a connexion betwixt them: that this idea arises from a repetition of their union- .... which are consequently felt by the soul, and not perceiv'd externally in bodies.[৩৩]

হিউম কার্য-কারণের যে অনিবার্যতাকে অস্বীকার করেন তা কখনো কখনো সমর্থিত হয় বিজ্ঞানের দ্বারা— যেমন, আধুনিক কোয়ান্টাম তত্ত্বের দ্বারা। এর ব্যাখ্যায় রাসেল জানান:

> I am leaving out of account modern quantum. theory, which reinforces the above conclusion. So far as the physical sciences are concerned, Hume is wholly in the right; such propositions as 'A causes B' are never to be accepted- [৩৪]

তবে হিউম কারণকে নিয়ত পূর্ববর্তী ও কার্যকে নিয়ত পরবর্তী বলে স্বীকার করেন। তাঁর ধারণায় এর কোন ব্যত্যয় নেই।

কিন্তু হিউমের এই কার্য-কারণ সম্পর্কিত ধারণাকে নিরঙ্কুশ বলা যায় না। কারণ থাকলে কার্য হতেও পারে, আবার না-ও হতে পারে। কিন্তু কার্য সাধিত হয়েছে অথচ কারণ নেই — এমন দৃষ্টান্ত পাওয়া অসম্ভব। বৃষ্টি হয়েছে অথচ মেঘ করেনি, কিংবা উত্তাপ আছে অথচ তার তাপন-উৎস নেই- এমন দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে না। তাই কার্য-কারণ সম্পর্কের অনিবার্যতাকে একভাবে স্বীকার করতে হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এমন হতে পারে যে — কার্য আছে কিন্তু কারণ অজ্ঞাত। কিন্তু 'অজ্ঞাত' মানেই তা 'নেই' এমন নয়। যাকে আমরা 'অজ্ঞাত' বলি তা প্রকৃতপক্ষে আমাদের জ্ঞান বা অভিজ্ঞতার বাইরে। কিন্তু যা-কিছু আমাদের জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা বহির্ভূত — তাকেই অস্তিত্বহীন বলা যায় না। কেন না, জ্ঞান বা অভিজ্ঞতার সীমাবদ্ধতা আছে। তাই আমাদের জ্ঞান বা অভিজ্ঞতার বাইরেও অনেক কিছুর অস্তিত্ব আছে, বা থাকতে পারে। এইজন্যেই অভিজ্ঞতাবাদী (empirialist) হিউম একইসঙ্গে সংশয়বাদীও (sceptist)। মনে রাখতে হবে, আজ যা অজ্ঞাত কাল তা জ্ঞাত হতে পারে। অজস্র মৌমাছি মিলে কীভাবে মৌচাকে একই মাপের ষড়ভুজাকৃতি শতশত কুঠুরি নির্মাণ করে, বা বিনা শিক্ষায় (training) কীভাবে বাবুই পাখি অমন জটিল ও সুন্দর বাসা নির্মাণ করে — দীর্ঘকাল ধরে তা আমাদের কাছে অজ্ঞাত

© 2026 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

Volume 28 : 2025-2026
Journal of Philosophy and the Life-world
DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2026.28.00.25

ছিল। কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞানের জিন-ম্যাপিং তত্ত্বের দাক্ষিণ্যে তা এখন আমাদের কাছে আর অজ্ঞাত নয়।

দার্শনিক মিল হিউমের নিয়ত পূর্ববর্তী (পূর্বতঃসিদ্ধ) ও নিয়ত পরবর্তী (পরতঃসিদ্ধ) ধারণার সমালোচনা করে বলেছিলেন — দিন ও রাত্রির কোনোটিকেই কার্য ও কোনোটিকেই কারণ বলা যাবে না। কেন না, দিন ও রাত্রি চক্রাকারে আবর্তিত হয়। অর্থাৎ দিনের পর আসে রাত্রি, রাত্রির পর আবার দিন, এবং তার পর আবার আসে রাত্রি। এর কোনোটিকেই পূর্ববর্তী ও কোনোটিকেই পরবর্তী বলা যাবে না। দিন ও রাত্রির আবর্তনের মূল কারণ পৃথিবীর আহ্নিক গতি।

যাই হোক্, এর থেকে স্পষ্ট হয়, পুরাণবাগীশ যা বলেন — অর্থাৎ "পিছন যদি না থাকে তো সামনেটা কি থাকতে পারে? — তা অযযার্থ নয়। কার্য-কারণ সম্পর্কের অনিবার্যতার অনুষঙ্গেই একথা স্বীকার করতে হয়। স্বীকার করতে হয় যে, বর্তমানের অস্তিস্ত্ব সম্ভব হয়েছে অতীতের অস্তিত্বের কারণে। ফোটা ফুলের অস্তিত্ব অসম্ভব অতীতে তার কুঁড়ির অস্তিস্ত্ব ছাড়া। আমার অস্তিত্ব অসম্ভব আমার পূর্বপুরুষ ছাড়া।

কিন্তু 'রক্তকরবী'-র রাজা একথা স্বীকার করতে রাজি নয়। সে (রাজা)কাল সম্পর্কে তার আগের ধারণাকেই নূতনভাবে ব্যাখ্যা করে। সর্দারের উক্তিতে শুনি:

> রাজা বলেন, মহাকাল নবীনকে সম্মুখে প্রকাশ করে চলেছে, পণ্ডিত সেই কথাটাকে চাপা দিয়ে বলে: মহাকাল পুরাতনকে পিছনে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

রাজা এখানে কালকে আদি-অন্ত-হীন মহাকাল রূপেই দেখে। এবং তার কেবল সম্মুখ গতির কথাই বলে। রাজার ধারণায়, (আমাদের আগের উদাহরণে দেওয়া) 'ফোটাফুল' ও 'আমার' অস্তিত্ব নিয়ত – বর্তমানেরই এক প্রকাশরূপ। বস্তুত, 'নবীনের প্রকাশ' হল বস্তুর পরিবর্তনজনিত রূপ। কালের যোগে বস্তুর যে পরিবর্তন ঘটে সেই পরিবর্তনই হল নবীন। 'সম্মুখে প্রকাশ করে চলা' হল ক্রমাগত নূতন থেকে আবার নূতন, তার থেকে আবার নূতন — এইভাবে হয়ে চলা। কিন্তু এই ক্রমাগত নূতন হয়ে চলার অর্থ হল — পরিবর্তনের ক্রমিক ধারাকেও স্বীকার করা। রাজার কথাতে একভাবে আছে তারই স্বীকৃতি। আর, পরিবর্তন মানেই তা বোঝায় অবস্থান্তরকে — এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় উপনীত হওয়া। এই পরিবর্তন বা অবস্থান্তর ঘটে সময়ের যোগে। সুতরাং সময় যদি অসীম হয় তাহলে পরিবর্তনও অসীম। সময়কে যদি আমরা t এবং পরিবর্তনকে যদি আমরা s ভাবি তাহলে সময়— t থেকে t_1 t_2 t_3 $t_4....\infty$ এইভাবে এগোতে থাকে। এবং তখন তার যোগে ঘটা পরিবর্তনও — s থেকে s_1, s_2, s_3, $s_4...\infty$ এইভাবে হতে থাকে।

একথা ঠিক যে t এবং t_1 কখনো এক হতে পারে না ($t \neq t_1$), যেমন t_1 এবং t_2-ও কখনো এক হতে পারে না ($t_1 \neq t_2$)। একইরকমভাবে পরিবর্তনের ক্ষেত্রেও দাঁড়ায় $s \neq s_1$, $s_1 \neq s_2$ প্রভৃতি।

© 2026 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

Volume 28 : 2025-2026
Journal of Philosophy and the Life-world
DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2026.28.00.25

এখন t এবং t_1 যেহেতু এক নয়, বা t_1 ও t_2 যেহেতু এক নয়, তাই স্বীকার করতে যে — t হল t_1-এর পূর্ববর্তী দশা, t_1 হল t_2-র পূর্ববর্তী দশা। এই পূর্ববর্তী দশাকে সময়ের ক্ষেত্রে 'অতীত' এবং অবস্থার ক্ষেত্রে 'পুরাতন' বলা ছাড়া উপায় নেই। তাই রাজা যে নবীনের ক্রমিক প্রকাশের কথা বলে তা একভাবে কালের বিভাজনকে স্বীকৃতি দেয় — যা তার 'মহাকাল' ধারণার স্ববিরোধী হয়ে ওঠে। এবং তখন রাজার মহাকাল হয়ে দাঁড়ায় অজস্র instant point of time-এর সমাহার। চলচ্চিত্রে যে গতি আমরা প্রত্যক্ষ করি তা যেমন অজস্র তাৎক্ষণিক ও স্থির সময়-বিন্দুর সমাহার — এও ঠিক তেমনি। এবং এই সূত্রে কালের প্রবাহের ধারণা (flux) আর টেকে না- তা হয়ে দাঁড়ায় illusion বা Unreal। রবীন্দ্রনাথ নিজেও একসময় প্রকাশ করেছিলেন এ-ধরনের ভাবনা। 'পশ্চিম যাত্রীর ডায়ারি'র পরিশিষ্টে তিনি লিখেছিলেন:

> সিনেমাতে কালের পরিমাণ বদল করে দিয়ে যে ব্যায়াম-ক্রীড়া দেখানো হয় তাতে দেখি যে ঘড়ি-ধরা কালে যা একভাবে প্রত্যক্ষ, কালকে বিলম্বিত করে দিলে তাকেই অন্যভাবে দেখা যায়, অর্থাৎ স্বল্পকালের সংহতিতে যা চঞ্চল, বৃহৎ কালের ব্যাপ্তিতে তাই স্থির।[৩৫]

অথবা ভাবতে হয় সময়ের এমন এক রূপের কথা যা একই সঙ্গে স্থির সময়-বিন্দুর সমাহারও বটে, আবার প্রবাহও বটে — স্থিতিও বটে, গতিও বটে — অনেকটা আলো সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের ভাবনার মতো। বিজ্ঞানীদের ধারণায় আলো একইসঙ্গে কণাও বটে, আবার তরঙ্গও বটে। বিপ্রতীপ দুই রূপের যুগনদ্ধ প্রকাশ হিসেবে ভাবা যেতে পারে কলয়েড জাতীয় পদার্থের কথাও (যেমন টুথপেস্ট) — যা একইসঙ্গে কঠিনও বটে, আবার তরঙ্গও বটে।

কিন্তু 'মহাকাল পুরাতনকে পিছনে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে' — রাজার এ-কথা একভাবে সময়ের পশ্চাদগতি বা Backward Movement-এর কথা বলে — যা যৌক্তিক বিচারে অবান্তর। কল্পবিজ্ঞানের time travel-এর ক্ষেত্রে বা time-machine-এর ক্ষেত্রেই এর প্রয়োগ আকর্ষণীয়। রাজা সময়ের এই পশ্চাদ্‌গতিকে পণ্ডিতের অপব্যাখ্যা বলে মনে করে।'রক্তকরবী'-র প্রায় আট বছর পরে প্রকাশিত কবির 'কালের যাত্রা' (১৯৩২) নাটকটিতেও আছে সময়ের পশ্চাদ্‌গতি সম্পর্কে পণ্ডিতদের সমান্তরাল ভাবনার প্রকাশ। সেখানে প্রথম নাগরিক কাল সম্পর্কে পন্ডিতদের মত উদ্ধার করে বলে:

তাঁরা বলেন —

মহাকালের নিজের নাড়ীর টান পিছনের দিকে,
পাঁচজনের দড়ির টানে অগত্যা চলেন সামনে।

নইলে তিনি পিছু হটতে হটতে একেবারে
পৌঁছতেন

অনাদি কালের অতল গহ্বরে।[৩৬]

© 2026 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

Volume 28 : 2025-2026
Journal of Philosophy and the Life-world
DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2026.28.00.25

রক্তকরবীর রাজা নবীনের প্রত্যাশী। অতীতের ভারে রাজা ক্লান্ত ও বিধ্বস্ত বলেই নবীনের সংস্রবে নবীন হয়ে উঠতে চায়। রাজার এই মনোভাবের সমর্থনে অধ্যাপক সর্দারকে বলেছিলেন:

নন্দিনীর নিবিড়যৌবনের ছায়া বীথিকায় নবীনের মায়ামৃগীকে রাজা চকিতে চকিতে দেখতে পাচ্ছেন, ধরতে পারছেন না রেগে উঠছেন আমার বস্তুতত্ত্বের উপর।

নাটকের প্রথম খসড়ায় রাজা নিজেই তার এই নবীনের প্রতি আকর্ষণের কথা স্পষ্ট করে বলেছিল পুরাণবাগীশকে:

> আমি খুঁজচি যে-পরশমণিতে পুরাতন নিয়তই নূতন হয়ে উঠচে। তুমি তার রহস্য জান?

তাই রাজার কাছে অতীতের কোনো মূল্য নেই। এবং সেজন্যেই অতীতকে অস্বীকার করে রাজা। তার কাছে অতীত বা ভবিষ্যৎ নয় — বর্তমানই কেবল সত্য। কেন না, কেবল বর্তমানেই আছে নবীনকে লাভ করার সম্ভাবনা। ভবিষ্যৎ পুরোপুরি অনিশ্চয়তায় ভরা। আর, অতীত ইতিহাসের পাতায় শিলীভূত।

রাজার এ-ধারণা বার্গসঁর পাশাপাশি প্রায় অনিবার্যভাবে আমাদের পৌঁছে দেয় চতুর্থ শতাব্দীর একেবারে শেষ পাদে লেখা দার্শনিক সেন্ট অগাস্টিনের 'Confessions'-এর কাছে। সেন্ট অগাস্টিন বলেছিলেন, অতীত ও ভবিষ্যৎ কাল বলে কিছু নেই — কেবলমাত্র বর্তমানই আছে। তাঁর ধারণায় অতীত ও ভবিষ্যৎ বর্তমানেরই রূপভেদ। তাই তিনি বর্তমানেরই তিনটি রূপের কথা বলেছিলেন — ১. অতীত বিষয়ক বর্তমান ২. বর্তমান বিষয়ক বর্তমান ও ৩. ভবিষ্যৎ বিষয়ক বর্তমান। দার্শনিক বার্ট্রান্ড রাসেল অগাস্টিনের এই কালতত্ত্বের ব্যাখ্যায় যা বলেছিলেন তা সামান্য দীর্ঘ হলেও স্পষ্টভাবে বোঝার স্বার্থে আমরা তা উদ্ধার করি:

> Neither past nor future, he says, but only the present, really *is*; the present is only a moment, and time can only be measured while it is passing. Nevertheless, there really is time past and future. We seem here to be led into contradictions. The only way Augustine can find to avoid these contradictions is to say that past and future can only be thought of as present: 'past' must be identified with memory, and 'future' with expectation, memory and expectations being both present facts. There are, he says, three times: 'a present of things past, a present of things present, and a present of things future'. 'The present of things past is memory, the present of things present is sight; and the present of things future is expectation'. To say that

© 2026 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

Volume 28 : 2025-2026
Journal of Philosophy and the Life-world
DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2026.28.00.25

> there are three types, past, present, and future, is a loose way of speaking.[৩৭]

১৯৩৮ সালের মে-জুনে মংপুতে থাকা কালে রবীন্দ্রনাথও মৈত্রেয়ী দেবীকে বলেছিলেন:

> যা সম্মুখে, আর যা পিছনে আমার কাছে সে উভয়ই অস্তিত্বহীন। কেবল বর্তমানটুকুই সত্য, সত্য মানে প্রত্যক্ষ।[৩৮]

সেই সঙ্গে এও বলেছিলেন:

> কিন্তু যা প্রত্যক্ষ নয়, সেও সত্য হতে পারে। অতীত আমার কাছে নিশ্চিহ্ন, কিন্তু নিশ্চিহ্ন হয়তো সে নয়। ভবিষ্যৎ আমার কাছে অজানা, কিন্তু সেও আছে।[৩৯]

এ-রবীন্দ্রনাথ অগাস্টিন, হিউম ও বার্গসঁর সমগোত্রীয়। প্রসঙ্গত আমাদের মনে পড়ে, কবি এলিয়টও জানিয়েছিলেন যে, অতীত ও ভবিষ্যৎকাল বর্তমান কালেই এসে সমন্বিত হয় — কিংবা বলা যায়, তারা বর্তমানেরই রূপভেদ:

> Time past and time future
> what might have been and what has been
> Point to one end, which is always present.[৪০]

প্রশ্ন জাগে — সত্যিই কি যা 'পিছনে', যা বর্তমানে 'প্রত্যক্ষ নয়' তাকেই কি রবীন্দ্রনাথ 'অস্তিত্বহীন' বলে মনে করেন? রবীন্দ্রজীবনের একটা পর্বে আমরা দেখি — ভারতবর্ষের যা-কিছু প্রাচীন, যা-কিছু তার পুরাকথা ও পুরাণকথায় ব্যক্ত তার প্রতিই গভীর আকর্ষণ বোধ করেছিলেন তিনি। তাঁর 'প্রাচ্য ও প্রতীচ্য', 'নববর্ষ', 'ব্যাধি ও প্রতিকার', 'তপোবন' প্রভৃতি প্রবন্ধে ছড়িয়ে আছে তার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। 'নববর্ষ' প্রবন্ধে তিনি বললেন প্রাচীন ভারতীয় সমাজের অন্তর্নিহিত এক মহাশক্তির কথা। এবং তাঁর প্রত্যয়ী সিদ্ধান্ত — এই মহাশক্তি শুধু বর্তমানে, নয়, ভবিষ্যতেও ভারতবর্ষের সুরক্ষায় ও কল্যাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করবে:

> বহু দুর্গতির মধ্যে বহুশতাব্দী ধরিয়া ভারতবর্ষের অন্তর্নিহিত এই স্থির শক্তিই আমাদিগকে রক্ষা করিয়া আসিয়াছে; এবং সময়কালে এই শক্তিই... জাগ্রত হইয়া সমস্ত ভারতবর্ষের উপরে আপন বরাভয়হস্ত প্রসারিত করিবে –।[৪১]

'তপোবন' প্রবন্ধে প্রাচীন ভারতবর্ষের তপোবনের আদর্শকেই তিনি চূড়ান্ত বলে ঘোষণা করলেন – "তপোবনই ছিল ভারতবর্ষের সভ্যতার চরম নিদর্শন"[৪২] এবং স্পষ্টভাবেই জানালেন যে — সেই সভ্যতার আদর্শ শুধু বর্তমানে নয়, ভবিষ্যতেও অনুসৃত হওয়া উচিত। 'নৈবেদ্য' (১৯০১) কাব্যের ৬০ সংখ্যক কবিতাতেও ('একদা এ ভারতের কোন্ বনতলে') কবি প্রাচীন ভারতের আদর্শের অনুসরণে নূতন ভারতকে সঞ্জীবিত করার কথা বললেন। দ্বিধাহীনভাবে জানালেন, এ-

© 2026 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

Volume 28 : 2025-2026
Journal of Philosophy and the Life-world
DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2026.28.00.25

ছাড়া অন্য কোনো পথই আর নেই:

রে মৃত ভারত,
শুধু সেই এক আছে, নাহি অন্য পথ।[৪৩]

যে-পুরাণকথা সম্বন্ধে 'রক্তকরবী'র রাজা ক্ষুব্ধ ও বিরক্ত সেই পুরাণকথা সম্পর্কে রাজার স্রষ্টা তাঁর 'তপোবন' প্রবন্ধে লিখলেন- "ভারতবর্ষের পুরাণকথায় যা-কিছু মহৎ আশ্চর্য পবিত্র, যা-কিছু শ্রেষ্ঠ এবং পূজ্য, সমস্ত সেই প্রাচীন তপোবনস্মৃতির সঙ্গেই জড়িত।"[৪৪]

রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক কবি ডব্লু. বি. ইয়েটস্‌ও কালের বিচারে যা অতীত তাকে মর্যাদার সঙ্গে শুধু স্বীকারই করেছিলেন তা নয় — রবীন্দ্রনাথের মতো তিনিও প্রত্যাশা করেছিলেন তার গৌরবময় পুনরাবর্তনের। আইরিশ আন্দোলনের নিষ্ঠ সমর্থক ইয়েটস্ আইরিশ জাতীয়তাবাদী আন্দোলন সম্পর্কে তাঁর 'Four Lectures'-এ (1902-04) বললেন — এ-আন্দোলনের অতীত মহিমা আবার নূতন করে সঞ্জীবিত হবে — যেমন করে বাইবেলোক্ত মহাপ্রলয়ের পরে কপোত তার বয়ে-নিয়ে-আসা সবুজ অলিভ-শাখার মাধ্যমে প্রকাশ করেছিল নূতনতর সৃষ্টির বাণী:

> [t]he national movements are not detached outbreaks of race pride. They are part of the Great War, of a war of the past and the future, of a noble past that tries to keep itself unchanged, hoping, perhaps vainly, the deluge will begin someday to fall, that the dove will someday return bringing with it the green bough.[৪৫]

অর্থাৎ, 'যা-ছিল' তার থেকে শুধু 'যা-হবে' তার দিকে যাত্রা নয়; কবি বিশ্বাস করতে ভালোবাসেন, 'যা-হবে'-র থেকে তা আবার এসে পৌঁছোবে 'যা-আছে'-তে। সুতরাং, যা অতীত, যা প্রাচীন তা অপ্রত্যক্ষ হলেও অস্তিত্বহীন বা অ-সত্য নয়। বস্তুত তা সত্যের ভিতরকার না-দেখা সত্য, অস্তিত্বের ভিতরকার সক্রিয় সংগুপ্ত অস্তিত্ব। রবীন্দ্রনাথের 'রূপ ও অরূপ' প্রবন্ধের উপমা ধার করে এর ব্যাখ্যায় বলা যায়:

> কোনো জিনিস বস্তুত স্থির নাই, তাহার সমস্ত অণু পরমাণু নিয়ত কম্পমান অথচ জানিবার বেলায় এবং ব্যবহার কালে আমরা তাহাকে স্থির বলিয়াই জানিতেছি। নিবিড়তম বস্তুও জালের মতো ছিদ্রবিশিষ্ট অথচ, জানিবার বেলায় তাহাকে আমরা অচ্ছিদ্র বলিয়াই জানি।[৪৬]

প্রত্যক্ষের সত্যকে অতিক্রম করে এ প্রত্যক্ষাতীত সত্য — এবং বোধকরি অধিকতর সত্য। Physics থেকে Metaphysics সর্বত্রই এর ব্যবহার। কালের ক্ষেত্রেও তেমনি প্রত্যক্ষ-বর্তমানের গভীরে লগ্ন হয়ে থাকে প্রত্যক্ষাতীত-অতীত। তাই তা অস্তিত্বহীন নয়। অ-সত্যও নয়। শুধু সেই

© 2026 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

Volume 28 : 2025-2026
Journal of Philosophy and the Life-world
DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2026.28.00.25

সত্যের মুখ আবৃত হয়ে আছে অজ্ঞানতার অপ্রতর অন্ধকারে। কবি রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রজ্ঞায় সেই অন্ধকারকে ভেদ করে দেখতে পান অতীতের মহিমা।এ অতীত অদৃশ্য হলেও সকর্মক। ভুবনে ভুবনে তারই গোপন ক্রিয়ায় ভুবনের হয়ে ওঠা। কবি তা জানেন বলেই তাঁর মুখ থেকে নিঃসৃত হয় অতীতের প্রতি এই ব্যাকুল আবেদন — এই স্তুতি:

কথা কও, কথা কও।
স্তব্ধ অতীত, হে গোপনচারী,
অচেতন তুমি নও —
কথা কেন নাহি কও।
তব সঞ্চার শুনেছি আমার
মর্মের মাঝখানে,
কত দিবসের কত সঞ্চয়
রেখে যাও মোর প্রাণে।
হে অতীত তুমি ভুবনে ভুবনে
কাজ করে যাও গোপনে গোপনে,
মুখর দিনের চপলতা-মাঝে
স্থির হয়ে তুমি রও।[৪৭]

এ অতীত অস্তিত্বসম্পন্ন, সচেতন ও সক্রিয়। তার ক্রিয়া প্রকাশ্যে গোচরীভূত না হলেও তা অস্তিত্বের ধারক। হৃৎপিন্ডের ক্রিয়া বাইরে থেকে দেখা যায় না। কিন্তু আড়ালে থেকে তা কাজ করে বলেই আমাদের বেঁচে থাকা সম্ভবপর হয়। অতীত যেহেতু কথা বলে না, মৌন হয়ে থাকে — তাই কবি তাকে সম্বোধন করেন 'মুনি' বলে — "হে মুনি অতীত।"[৪৮] কিন্তু এ 'মুনি' শুধু 'মৌন' অর্থে নয় — সত্যদ্রষ্টা অর্থেও। অতীত সত্যদ্রষ্টা এবং সত্য স্রষ্টাও। কেন না, তারই গোপন ক্রিয়ায় ভুবনের হয়ে-ওঠা। এই প্রসঙ্গে বলা যায়, — উইলিয়াম জেমস্ তাঁর 'Principles of Psychology' (1890) গ্রন্থের 'Specious Present' তত্ত্বে যে 'nowness'-এর — অর্থাৎ বর্তমানের — কথা বলেছিলেন তাতে অতীতের বোধের (Sense of the past) সংলগ্নতার কথা স্বীকার করেছিলেন। এই সঙ্গেই প্রশ্ন জাগে 'রক্তকরবী'তে রাজা যাকে 'নবীন' বলে সেই 'নবীন' ও' নূতন' কি সমার্থক? আমাদের আলোচনায় এ-দুটি শব্দকে প্রায় সমার্থক হিসেবেই ধরে নিয়েছি আমরা। কেন না, 'রক্তকরবী' নাটকের প্রথম খসড়ায় রাজা 'নবীন'-এর পরিবর্তে ব্যবহার করে 'নূতন' শব্দটি — "আমি খুঁজচি যে পরশমণিতে পুরাতন নিয়তই নূতন হয়ে উঠচে।" কিন্তু এ-দুটি শব্দের পৃথক দার্শনিক তাৎপর্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ আমাদের অবহিত করেছিলেন 'রক্তকরবী'র কয়েক বছর পরে লেখা তাঁর 'নবীন' নাটিকায় (১৯৩২)। সেখানে 'নূতন' ও 'নবীন-এর পার্থক্য নির্দেশ করে তিনি বলেছিলেন — 'নূতন' হল যা পুরাতনের থেকে স্বতন্ত্র

© 2026 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

Volume 28 : 2025-2026
Journal of Philosophy and the Life-world
DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2026.28.00.25

ধরনের; কিন্তু 'নবীন' হল চিরন্তনেরই পুনরাবর্তন। অর্থাৎ, পরিবর্তিত রূপে প্রকাশ হল 'নূতন'; আর যা চিরকালের তার অপরিবর্তিত রূপে পুনরায় প্রকাশ হল 'নবীন'। অথবা আর এক ভাবে বলা যায় — যা ছিল না তার প্রকাশ হল নূতন; যা ছিল তার পুনঃপ্রকাশ হল নবীন। কবি বলেন:

> ও দিকে আধুনিক আমলের বারোয়ারির দল বলছে, উৎসবে নতুন কিছু চাই। কোণা-কাটা ত্যাড়াবাঁকা দুম্‌দাম্‌-করা কড়া-ফ্যাশানের আহেলা বেলাতি নতুনকে না হলে তাদের শুকনো মেজাজে জোর পৌঁচচ্ছে না। কিন্তু যাঁদের রসবেদনা আছে তাঁরা কানে কানে বলে গেলেন, আমরা নতুন চাই নে, আমরা চাই নবীনকে। এঁরা বলেন, মাধবী বছরে বছরে বাঁকা করে খোঁচা মেরে সাজ বদলায় না, অশোক পলাশ একই পুরাতন রঙে নিঃসংকোচে বারে বারে রঙিন। চিরপুরাতনী ধরণী চিরপুরাতন নবীনের দিকে তাকিয়ে বলছে, 'লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু তবু হিয়া জুড়ন না গেল'![৪৯]

তবে কবি সবসময় এই দুই শব্দের তাৎপর্যগত ভিন্নতা বজায় রেখে তাঁর সাহিত্যকর্মে যে শব্দ দুটিকে প্রয়োগ করেছেন — তা বলা যাবে না। 'রক্তকরবীর'ই প্রায় আট বছর আগে প্রকাশিত তাঁর 'ফাল্গুনী' (১৯১৬) নাটকে এবং 'রক্তকরবী'-র প্রায় আট বছর পরে প্রকাশিত তাঁর 'তাসের দেশ' (১৯৩৩) নাটকে — যেগুলিতে নবীনতার জয়গান গেয়েছেন কবি — আমরা লক্ষ করি শব্দ দুটিকে কখনো-কখনো সমার্থক হিসেবেই প্রয়োগ করেছেন তিনি। তবে মোটামুটিভাবে কবির ঝোঁক ছিল যা-চিরন্তন তার পুনরাবর্তনকে 'নবীন' হিসেবে দেখার। 'ফাল্গুনী'-তে বকুল, পারুল, আমের মুকুল 'নবীন বেশে'[৫০] ফিরে আসে। বছরে বছরে এই ফিরে আসাই নবীনতা। চন্দ্রহাস সেখানে 'বারে বারেই প্রথম, ফিরে ফিরেই প্রথম'— অর্থাৎ চিরনবীন। 'তাসের দেশ'-এ রাজপুত্র যে-মানিকের খোঁজ পায় তা হল 'নবীনা' — অর্থাৎ 'যৌবনের নবীন রূপ'।[৫১] যে-যৌবন প্রজন্মের পর প্রজন্মে ফিরে ফিরে আসে- দেশ-কাল নিরপেক্ষভাবে ফিরে ফিরে আসে — রাজপুত্র তাকেই প্রত্যক্ষ করে তাসের দেশে। 'রক্তকরবী'-তে পৌষের গানে পাকা-ফসলে যে পৌষের ডালা ভরে ওঠার কথা তা নবীনের দ্যোতক — তা বারে-বারেই ফিরে আসে। তবে 'তাসের দেশ'-এ গোলামের মুখ দিয়ে রবীন্দ্রনাথ যেন খানিকটা ব্যঙ্গই করেছেন 'নতুন' শব্দটিকে। রাজা যখন গোলামের কাছে জানতে চায় কৃষ্টিটা কী জিনিস, তখন তার উত্তরে গোলাম জানায় — "না মহারাজ, এ মিষ্টিও নয়, স্পষ্টও নয়, কিন্তু যাকে বলে নতুন, নবতম অবদান"।[৫২] বুঝতে অসুবিধে হয় না যে — এ ব্যঙ্গের উদ্দিষ্ট বাংলার সমকালীন শিল্প-সাহিত্য — যা প্রচলিত ধ্যান-ধারণা ও মূল্যবোধ প্রভৃতিকে অস্বীকার করে নূতনত্বের তথা আধুনিকত্বের মোহে নগ্নতা, যৌনতা, যথাযথতা (Naturalism), অস্বাভাবিক মনোবিজ্ঞান (Abnormal Psychology) প্রভৃতির অতিরেককে গুরুত্ব দিতে চেয়েছিল। নূতন ধরনের সাহিত্যের প্রতি এই প্রবল আগ্রহ উদাহরণসহ ব্যক্ত হয়েছিল 'রক্তকরবী'র পাঁচ বছর পরে প্রকাশিত কবির 'শেষের কবিতা' (১৯২৯) উপন্যাসের অমিতর মুখে:

© 2026 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2026.28.00.25

> এ কথা বলব না যে, পরবর্তীদের কাছ থেকে আরো ভালো কিছু চাই, বলব অন্য কিছু চাই। ফজলি আম ফুরোলে বলব না, “আনো ফজলিতর আম”। বলব, “নতুনবাজার থেকে বড়ো দেখে আতা নিয়ে এসো তো হে”।[৫৩]

এর সপক্ষে অমিতর প্রধান যুক্তি — “ভালো লাগার এভোল্যুশন আছে”[৫৪]। তাই আধুনিক কালে চাই নূতন সাহিত্য - যার সঙ্গে পুরাতনের যোগ থাকবে না:

> প্রেসিডেন্টের কাছে চাই কড়া লাইনের, খাড়া লাইনের রচনা — তীরের মতো, বর্শার ফলার মতো, কাঁটার মতো। ফুলের মতো নয়, বিদ্যুতের রেখার মতো। ন্যুর‍্যালজিয়ার ব্যথার মতো। খোঁচাওয়ালা কোণওয়ালা গথিক গির্জের ছাঁদে, মন্দিরের মণ্ডপের ছাঁদে নয়। এমন-কি যদি চটকল পাটকল অথবা সেক্রেটারিয়েট বিল্‌ডিঙের আদলে হয় ক্ষতি নেই”।[৫৫]

অমিতর মতে এই আধুনিক সাহিত্যের দৃষ্টি থাকবে না পাঠকের মন ভোলাবার দিকে — দৃষ্টি থাকবে মন কেড়ে নেওয়ার দিকে।

তবে একথা অস্বীকার করা যায় না যে — নূতন বা পরিবর্তন মানেই তা সবসময় শুভংকর বা কল্যাণকর নয়। উষ্ণতা বৃদ্ধির কারণে হিমবাহের অতিরিক্ত গলন, এবং তার ফলে সমুদ্রের অতিরিক্ত জলস্তর বৃদ্ধি আধুনিক বিশ্বে এক অভিনব ঘটনা। কিন্তু একে বিশ্বের পক্ষে মঙ্গলজনক বলা যাবে না কিছুতেই।

যাই হোক্, সেজন্যেই, ‘রক্তকরবী’র রাজা যখন বলে — “মহাকাল নবীনকে সম্মুখে প্রকাশ করে চলেছে” — তখন আমাদের বুঝতে হয়, সে চিরন্তনের বা চিরপুরাতনের পুনরাবির্ভাবের কথাই বলতে চায়। অর্থাৎ সে অতীতকে অস্বীকার করে না। বরং অতীতকে স্বাঙ্গীকৃত করে নিয়েই নবীনের হয়ে-ওঠার কথা বলে। অতীত তাই বর্তমান— এমনকী ভবিষ্যৎ কালেরও — সুগভীর তলদেশে সংযুক্ত এক কাল। এবং তার নিষ্ক্রিয়তার মধ্যেই আছে সক্রিয়তার কারণ। উদাহরণ দিয়ে বলা যায়, নিউক্লিয়াসের প্রোটন স্থির হয়েই থাকে। কিন্তু তার এই স্থিরত্বই ইলেকট্রনের ঘূর্ণনের কারণ। কোনো উপায়ে নিউক্লিয়াস থেকে প্রোটনকে বিচ্ছিন্ন করে নিলে ইলেকট্রনের ঘূর্ণন আপনা-থেকেই বন্ধ হয়ে যায়।

লক্ষ করতে হয়, রাজা তার উক্তিতে কালকে বারবার 'মহাকাল' বলে উল্লেখ করে — কোনও খন্ড কালের কথা সে বলে না। সে বলে — “মহাকাল নবীনকে সম্মুখে প্রকাশ করে চলেছে।... মহাকাল পুরাতনকে পিছনে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে” ইত্যাদি। রাজার মতো রাজার স্রষ্টার ধারণাতেও যে কাল অখণ্ড ও অসীম সে-কথা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি।

এই মহাকাল বা অনন্ত কালের অনুষঙ্গে রবীন্দ্রনাথ পৌঁছে যান এক কালাতীতের বোধে। কালাতীতের ধারণা কোনো কালহীনতার বা সময়-শূন্যতার ধারণা নয় — তা প্রকৃতপক্ষে কালের

© 2026 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

Volume 28 : 2025-2026
Journal of Philosophy and the Life-world
DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2026.28.00.25

বিভাজনগত অনস্তিত্বের ধারণা। অর্থাৎ সেখানে অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ প্রভৃতি কালের কোনো রকম বিভাজন থাকে না। তা জাগতিক কালচেতনার ঊর্ধ্বে তাকে বলা যায় অতীন্দ্রিয় কাল বা Transcendental Time। হিন্দু-দর্শনে ব্রহ্মের স্বরূপ সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে — তিনি অজর, অমর, অক্ষয় ও অব্যয়। 'অহোরাত্রাণ্যর্ধমাসা মাসা ঋতবঃ সম্বৎসরা ইতি বিধৃতাস্তিষ্ঠন্তি'[৫৬]— অর্থাৎ তাঁর (ব্রহ্মের) মধ্যেই দিন এবং রাত্রি, পক্ষ এবং মাস, ঋতু এবং সংবৎসর বিধৃত হয়ে অবস্থান করছে। পরিবর্তনহীন এক সত্তা। জাগতিক কালের অস্তিত্ব নেই বলেই সেই কাল-সঞ্জাত পরিবর্তনও নেই ব্রহ্মের ক্ষেত্রে। উপনিষদে কালকে ব্রহ্মের প্রকাশ হিসেবেই স্বীকার করা হয়েছে। অর্থাৎ, ব্রহ্ম কালের অতিবর্তী। বৌদ্ধদর্শনেও কাল সম্পর্কে এই কথা বলা হয়েছে খুব গুরুত্বের সঙ্গে। বৌদ্ধদর্শন অনুসারে কালকে যে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে তার একটি আপেক্ষিক কাল (relative time) — যা পরিবর্তনশীল ও ক্ষণস্থায়ী (transient); অন্যটি হল পরমার্থ কাল বা absolute time। এই পরমার্থ কাল হল শাশ্বত ও অপরিবর্তনীয়। তা জাগতিক নিয়ম-কানুনের ঊর্ধ্বে। চৈনিক তাও-দর্শনও কালের অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ রূপ-কে (linear motion) অস্বীকার করে এক শাশ্বত কালের কথা বলে — যা 'দাও' বা মহাবিশ্বের অংশভাক্।

রবীন্দ্রনাথের কালহীনতার ধারণা সম্ভবত ভারতীয় দর্শন থেকেই লাভ করা। তাঁর 'শেষ সপ্তক' কাব্যের 'মর্মবাণী' কবিতায় কবি বলেন এই কালহীনতার কথা:

তোমার ছায়ায় বসে বিপুল বিরহ
মোরে ঘেরে;
বর্তমান মুহূর্তেরে
অবলুপ্ত করি দেয় কালহীনতায়।[৫৭]

অর্থাৎ, বোঝা যায়, রবীন্দ্রনাথ যে-কালহীনতার কথা বলেন তা কালের রৈখিক গতির অনস্তিত্বকেই ইঙ্গিত করে। বর্তমান সেখানে অবলুপ্ত হয়ে যায় শাশ্বত কালের গর্ভে। কবি এলিয়ট তাঁর 'Burnt Norton' কবিতায় আমাদের শুনিয়েছেন timelessness বা নিঃসময়ের কথা — কালের ধারণা থেকে কালশূন্যতার ধারণায় উত্তীর্ণ হওয়ার কথা— "Only the cause and end of movement Timeless".[৫৮]

কালহীনতার পাশাপাশি রবীন্দ্রনাথ আবার বলেন এক 'সময়হারা সময়'-এর কথা। এই 'সময়হারা সময়' কোনো timelessness বা নিঃসময়ের ধারণা নয় — এ হল time within time বা সময়ের ভিতরকার সময়। সময়ের রৈখিক গতির মধ্যে দাঁড়িয়ে গতিহীন অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া। 'রক্তকরবী' নাটকের দ্বিতীয় খসড়ায় নন্দিনী রঞ্জনের উদ্দেশে গাওয়া গানে বলে এই 'সময়হারা সময়'-এর কথা। রাজার সঙ্গে কথোপকথন-কালে সে গান ধরে:

যখন দখিন হাওয়া কানন ঘিরে
এক কথা কয় ফিরে ফিরে,-

© 2026 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

যখন পূর্ণিমা চাঁদ কারে চেয়ে
একতানে দেয় আকাশ ছেয়ে,
যেন সময়হারা সেই সময়ে
একটি সে গান গাই।

নন্দিনীর এই 'সময়হারা সময়'-এর ধারণা personal Time-এর স্বগোত্রীয়। তা Universal Time-কে স্বীকার করেও গড়ে নেয় সময়ের এক নিজস্ব পরিসর।

কালহীনতার ধারণা জাগতিক কাল-বিভাজনকে অস্বীকার করে। তাই সেক্ষেত্রে কালের যোগে কোনো ক্রিয়া সংঘটিত হয় না। তা অক্রিয় বা inert। ক্রিয়ার অনস্তিত্ববশত তাই সেখানে কোনো পরিবর্তনও সাধিত হয় না। এর ধারণা জ্ঞানাত্মক।

অন্যদিকে 'সময়হারা সময়' হল এক স্থির বা স্তব্ধ সময়। এর ধারণা মনস্তাত্ত্বিক। এর যোগ ব্যক্তির অনুভূতি বা feeling-এর সঙ্গে। তাই তা অক্রিয় বা inert নয় — তা নিষ্ক্রিয় বা inactive। তবে এই নিষ্ক্রিয়তার মধ্যেও কখনো কখনো থাকতে পারে সক্রিয়তা। কোনো ব্যক্তি কোনো কারণে অচৈতন্য হয়ে গেলেও তাঁর চৈতন্যের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায় না। ভিতরে ভিতরে তা চলতে থাকে সঠিকভাবেই। সেজন্যেই চেতনালাভের পরে সেই ব্যক্তি আবার সবকিছু স্মরণ করতে পারেন। জড়বস্তুর উদাহরণ দিয়ে বলা যায় — আমাদের মোবাইল ফোন তিন-চার দিন switch off থাকার পর যদি আমরা switch on করি, তখন ঐ ফোন switch off করার নির্দিষ্ট সময় বা তারিখটিকে দেখায় না। Switch on করার সঙ্গে সঙ্গেই তা দেখায় switch on করারই তারিখ ও সময়টিকে। অর্থাৎ, switch off করার কারণে ফোন বাহ্যত নিষ্ক্রিয় থাকলেও ভিতরে-ভিতরে তা ছিল সক্রিয়। গীতার যোগ-সমাধির ধারণার অনুসরণে নিষ্ক্রিয়তার মধ্যে এই সক্রিয়তাকে বলা যায় - action in inaction। সেজন্যেই নাটকের দ্বিতীয় খসড়ায় দেখি 'সময়হারা সময়' এ দাঁড়িয়ে গান গায় নন্দিনী। গানে সে বলে:

সময়হারা সেই সময়ে
একটি সে গান গাই।

কবির গীতবিতানের গানেও আমরা শুনি এমনি এক সময়হারা-সময় বা কালহারা-কালের কথা:

পুব-হাওয়া ধায় আকাশ তলে,
তার সাথে মোর ভাবনা চলে
কালহারা কোন্ কালের পানে ছুটে।[৫৯]

পাশ্চাত্য দর্শনে আছে সাধারণত কালের দু-ধরনের dimension — Finite Time ও Infinite Time। তুলনায় ভারতীয় দর্শন বলে সময়ের তিন ধরনের dimension-এর কথা — খণ্ডকাল,

© 2026 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

Volume 28 : 2025-2026
Journal of Philosophy and the Life-world
DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2026.28.00.25

অন্তহীন কাল বা মহাকাল, এবং অতীন্দ্রিয় কাল বা Transcendental Time। একথা ঠিক যে দার্শনিক কান্টও বলেছিলেন Transcendental Time-এর কথা। কিন্তু তার সঙ্গে পার্থক্য আছে ভারতবর্ষীয় ধারণার। কান্টের Transcendental Time হল subjective — যা আমাদের অভিজ্ঞতার যোগে জগৎ সম্পর্কে ধারণা গড়ে তুলতে সাহায্য করে। কিন্তু ভারতীয় দর্শন যে অতীন্দ্রিয় কালের কথা বলে তা অতিজাগতিক ও আধ্যাত্মিক-মাত্রা সম্পন্ন। ভারতবর্ষীয় তন্ত্রের ধারণানুসারে খণ্ডকালকে গ্রাস করে মহাকাল, আর মহাকালকে কলন করেন কালী। কালী তাই সময়ের এক অতিবৃহৎ একক। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সময়-দর্শনে — সম্ভবত রবীন্দ্রনাথ কবি বলেই — আছে সময়ের চার ধরনের dimension — খণ্ডকাল বা ঘড়ি-মাপা-কাল, আদি-অন্তহীন মহাকাল, আধ্যত্মিক মাত্রাঋদ্ধ অতিন্দ্রীয় কাল, এবং কালহারা কাল বা সময়হারা সময় — যা সময়হীন হয়েও সময়ঋদ্ধ; 'নেই' এবং 'আছে'-র যুগনদ্ধ রূপ।

প্রসঙ্গত বলা দরকার, হেরাক্লিটাস বা বার্গসঁদের মত মতো রবীন্দ্রনাথ যে কেবল কালের সম্মুখ গতিতেই বিশ্বাস করেন তা নয়। এরই পাশাপাশি তিনি কালের চক্রাকার (circular) গতিকেও স্বীকার করেন। প্রাচীন গ্রিসে দার্শনিক হেরাক্লিটাস কালের রৈখিক গতিকে স্বীকার করলেও তাঁর পরবর্তীকালের দার্শনিক এম্পেডোক্লিস এককভাবে কালের চক্রাকার গতির স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। এম্পেডোক্লিস এক 'periodic world-cycles'[৬০]-এর কথা বলেছিলেন - যার ব্যাখ্যা হল:

> The world process is, therefore, properly speaking circular, and
> has neither beginning nor end.[৬১]

বিশ্বের নির্দিষ্ট পর্যাবৃত্ত ঘটনার অনুসিদ্ধান্ত হিসেবে আমরা অনিবার্যভাবেই পৌঁছে যাই কালের চক্রাকার গতির ধারণায়। ভারতবর্ষে হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন দর্শনে কালের এই চক্রাকার গতিকে স্বীকার করা হয়েছে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে। হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন দর্শন বিশ্বের সৃষ্টি ও ধ্বংসের ক্রমিক আবর্তন এবং জন্মান্তরবাদকে স্বীকৃতি দেয়। হিন্দু-পুরাণ অনুসারে সব মহাযুগেই ফিরে ফিরে আসে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলিযুগ। মহাভারতে মাসগুলিকে বৎসর-চক্রের অর (spoke) হিসাবে দেখা হয়েছে। বৌদ্ধদর্শনও কালচক্রের আবর্তনকে স্বীকার করে গুরুত্বের সঙ্গে। এসবের উত্তরসূরি বলে রবীন্দ্রনাথের ধারণায় প্রায় অনিবার্যভাবে আছে কালের চক্রাকার গতির স্বীকৃতি। তার এক 'বলাকা' কাব্যেই আমরা লক্ষ্য করি সময়ের সম্মুখ গতি ও চক্রাকার গতির প্রকাশ। 'বলাকা' কাব্যের ৮ সংখ্যক কবিতায় (হে বিরাট নদি) যে কালের সম্মুখগতির প্রকাশ আছে তা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। কিন্তু কাব্যের ৩৬ সংখ্যক কবিতায় (সন্ধ্যারাগে ঝিলিমিলি) যে বলাকার চিত্রকল্প আছে, বা ৪৫ সংখ্যক কবিতায় (পুরাতন বৎসরের জীর্ণ ক্লান্ত রাত্রি) যে বৎসরের চিত্রকল্প আছে তা কালের চক্রাকার গতির দ্যোতক। বলাকা পরিযায়ী পাখি। বছরের একটি নির্দিষ্ট সময়ে তারা এক স্থান থেকে অন্যত্র চলে গিয়ে আবার নির্দিষ্ট সময়ে পূর্বের স্থানে ফিরে আসে। বলাকার এই পর্যাবৃত্ত গতি কালের চক্রাকার গতির সূত্রেই বিধৃত। তেমনি ৪৫

© 2026 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2026.28.00.25

সংখ্যক কবিতায় থাকা বৎসরের চিত্রকল্পও কালের আবর্তনকে স্বীকৃতি দেয়।

আপাতদৃষ্টিতে কালের এই সম্মুখ গতি ও চক্রাকার গতি বৈপরীত্যমূলক মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে তা নয়। চক্রাকার গতি মানে তা সবসময়ই একটি নির্দিষ্ট স্থানে বারংবার আবর্তিত হওয়া নয়। চক্রাকার গতির মাধ্যমেও সম্ভব হয় সম্মুখের দিকে অগ্রগতি। আহ্নিক গতিতে পৃথিবী নিজের মেরুদন্ডের উপর একবার আবর্তিত হয়। কিন্তু সেই আবর্তন এক জায়গাতেই বারংবার ঘটে না। অর্থাৎ আবর্তন-বৃত্তের কেন্দ্র বা নাভি এক জায়গাতেই স্থির থাকে না। এই আবর্তনের মাধ্যমেই পৃথিবী ক্রমাগত অগ্রসর হয় সম্মুখের দিকে। এবং তারই ফলে সংঘটিত হয় পৃথিবীর বার্ষিক গতি — যার ফলে পরিবর্তন ঘটে ঋতুসমূহের।

'রক্তকরবী' নাটকে রবীন্দ্রনাথ যে পৌষের গানের কথা বলেন, বা বসন্তের কথা (নন্দিনীর উক্তিতে), বা ফসল কাটার (বিশুর গানে) কথা বলেন তা কালের চক্রাকার গতির কথাই ব্যক্ত করে। 'নবীন' কথাটিতে যে এই কালের চক্রাকার গতির দ্যোতনা আছে তা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। অর্থাৎ 'রক্তকরবী' নাটকে যেমন আছে কালের সম্মুখ গতির প্রকাশ।

© 2026 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

Volume 28 : 2025-2026
Journal of Philosophy and the Life-world
DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2026.28.00.25

তথ্যসূত্র

১. A Critical History of Greek Philosophy - W.T. Stace, Macmillan & Co. Ltd., London, 1962, PP.292

২. Living Thoughts of Immanuel Kant Julien Benda, Rupa & Co., New Delhi, Second Impression 2003, PP. 80-81.

৩. A Critical History of Greek Philosophy......... PP. 292.

৪. A History of Modern Philosophy - William Kelley Wright, The Macmillian Company, New York, Fifteenth Printing, 1958, PP. 266.

৫. A History of Philosophy (VOL. IV) - Frederick Copleston, S.J., Image Books, Doubleday, New York, January 1994, PP. 303.

৬. ২ সংখ্যক/শেষ লেখা, রবীন্দ্র রচনাবলী, তৃতীয় খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, ২৫ বৈশাখ ১৩৬৮, পৃ. ২৩২

৭. পশ্চিম যাত্রীর ডায়ারি (পরিশিষ্ট), রবীন্দ্র রচনাবলী, দশম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, ২৫ বৈশাখ ১৩৬৮,

৮. তদেব, পৃ. ৫৯৬

৯. ছিন্নপত্রাবলী - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ আষাঢ় ১৪১১, ১২১ সংখ্যক পত্র, চিঠির তারিখ: ২৪ জুন, ১৮৯৪, পৃ. ১৮৫

১০. ৭ সংখ্যক / শেষ সপ্তক, রবীন্দ্র রচনাবলী, তৃতীয় খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, ২৫ বৈশাখ ১৩৬৮, পৃ. ১৫৫

১১. আবেদন/ চিত্রা, রবীন্দ্র-রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, আষাঢ় ১৩৮৭, জুলাই ১৯৮০, পৃ. ৬০৯

১২. তদেব, পৃ. ৬১০

১৩. ডাকঘর, রবীন্দ্র রচনাবলী, ষষ্ঠ খন্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, ২৫ বৈশাখ ১৩৬৮, পৃ. ৪২৬

১৪. সময়হারা/আকাশপ্রদীপ, রবীন্দ্র-রচনাবলী, তৃতীয় খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, অগ্রহায়ণ ১৩৯০, নভেম্বর ১৯৮৩, পৃ. ৬৬৬

১৫. রবীন্দ্র-রচনাবলী, নবম খন্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, চৈত্র ১৩৯৪, মার্চ ১৯৮৮, পৃ. ৭৬

১৬. রবীন্দ্র-রচনাবলী, পঞ্চম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, শ্রাবণ ১৩৯১, জুলাই ১৯৮৪, পৃ. ৬৬৩

© 2026 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

১৭. ছিন্নপত্র-রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ অগ্রহায়ণ ১৪১১, পৃ. 222 [১১০ সংখ্যক পত্র]

১৮. আট বছর আগের একদিন/ মহাপৃথিবী- জীবনানন্দ দাশ, জীবনানন্দ দাশের কাব্যসমগ্র- সম্পাঃ ক্ষেত্র গুপ্ত, ভারবি, কলকাতা-৭৩, পুনর্মুদ্রণ: বৈশাখ ১৪২৪, এপ্রিল ২০১৭, পৃ.২৩৫

১৯. ৮ সংখ্যক/বলাকা, রবীন্দ্র-রচনাবলী, দ্বিতীয় খন্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, বৈশাখ ১৩৮৯, মে ১৯৮২, পৃ. ৪৫১

২০. The Complete Poems and Plays - T. S. Eliot, Faber and Faber Limited, London, 2004 (Paperback edition), PP.173.

২১. সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কাব্যসংগ্রহ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭০০০৭৩, পুনর্মুদ্রণ: ১৩৯৯ মাঘ, জানুয়ারি ১৯৯৩, পৃ. ৭৫-৭৬

২২. সময়হারা/শিশু ভোলানাথ (সংযোজন), রবীন্দ্র-রচনাবলী, দ্বিতীয় খন্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, বৈশাখ ১৩৮৯, মে ১৯৮২, পৃ. ৫৮১.

২৩. অনন্ত প্রেম/মানসী, রবীন্দ্র-রচনাবলী, প্রথম খন্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, আষাঢ় ১৩৮৭, জুলাই ১৯৮০, পৃ. ৪০৮

২৪. এই ল্যাটিন কথাটি দার্শনিক দেকার্তের বিখ্যাত উক্তি 'Cosito ergo sum' কথাটির অনুসরণে তৈরি করে নেওয়া। 'Cosito ergo sum' কথাটির অর্থ- 'I think, therefore I am'.। সেইভাবে 'Amo ergo sum' কথাটির অর্থ দাঁড়ায়- 'I love, therefore I am am'.। অর্থাৎ 'আমি ভালোবাসি, তাই আমি আছি'। ভালোবাসা ছাড়া আমার অস্তিত্ব নেই।

২৫. Images And Symbols: Studies in Religious Symbolism- Mircea Eliade, Translated by Philip Mairet, Harvill Press, London, 1961, PP. 64

২৬. Myth and Meaning - Claude Levi-Strauss, Routledge, London, 2001, PP. 18

২৭. Ibid, PP-18.

২৮. History of Western Philosophy - Bertrand Russell, George Allen & Unwin Ltd., London, Ninth Impression 1965, PP. 763.

২৯. Ibid, PP. 764

৩০. The Philosophy of Time - Ed. by Robin Le Poidevin and Murray

© 2026 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

Volume 28 : 2025-2026
Journal of Philosophy and the Life-world
DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2026.28.00.25

MacBeath, Oxford University Press, Reprinted 2009, PP. 178.

৩১. Space and Time - Richard Swinburne, Macmillan, London, 1968, PP. 207.

৩২. The Philosophy of Time - Ed. by Robin Le Poidevin and Murray MacBeath, Oxford University Press, Reprinted 2009, PP. 182.

৩৩. History of Western Philosophy - Bertrand Russell, George Allen & Unwin Ltd., London, Ninth Impression 1965, PP. 642.

৩৪. Ibid, PP. 643

৩৫. পশ্চিম যাত্রীর ডায়ারি (পরিশিষ্ট), রবীন্দ্র রচনাবলী, দশম খন্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, ২৫ বৈশাখ ১৩৬৮, পৃ. ৫৯৬

৩৬. কালের যাত্রা, রবীন্দ্র-রচনাবলী, ষষ্ঠ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ফাল্গুন ১৩৯১, মার্চ ১৯৮৫, পৃ. ২৬৫.

৩৭. History of Western Philosophy - Bertrand Russell, George Allen & Unwin Ltd., London, Ninth Impression 1965, PP. 352.

৩৮. মংপুতে রবীন্দ্রনাথ- মৈত্রেয়ী দেবী, প্রাইমা পাবলিকেশনস্, কলিকাতা - ৭০০০০৭, সপ্তদশ মুদ্রণ, এপ্রিল ২০১৩, পৃ. ১০

৩৯. তদেব, পৃ. ১০

৪০. Burnt Norton / Collected Poems (1909-1935) - T.S. Eliot, Faber & Faber, Fifteenth Impression, PP. 190.

৪১. রবীন্দ্র-রচনাবলী, ত্রয়োদশ খন্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, অগ্রহায়ণ ১৩৯৭, নভেম্বর ১৯৯০, পৃ.১১৬

৪২. রবীন্দ্র-রচনাবলী, চতুর্দশ খন্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, মাঘ ১৩৯৮, ফেব্রুয়ারি ১৯৯২, পৃ. ৩৬১

৪৩. রবীন্দ্র-রচনাবলী, প্রথম খন্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, আষাঢ় ১৩৮৭, জুলাই ১৯৮০, পৃ. ৯৮৯

৪৪. রবীন্দ্র-রচনাবলী, চতুর্দশ খন্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, মাঘ ১৩৯৮, ফেব্রুয়ারি ১৯৯২, পৃ. ৩৫০

৪৫. Empire, Nationalism and the Postcolonial World - Michael Collins, Routledge, London And New York, 2012, PP.114.

© 2026 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

Volume 28 : 2025-2026
Journal of Philosophy and the Life-world
DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2026.28.00.25

[Yeats, 'Four Lectures, Edited by Richard Londriville'.]

৪৬. রবীন্দ্র-রচনাবলী, চতুর্দশ খন্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, মাঘ ১৩৯৮, ফেব্রুয়ারি ১৯৯২, পৃ. ৯৫০

৪৭. রবীন্দ্র-রচনাবলী, দ্বিতীয় খন্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, বৈশাখ ১৩৮৯, মে ১৯৮২, পৃ. ৯১ [৩৪ সংখ্যক / উৎসর্গ]

৪৮. তদেব, পৃঃ ৯১

৪৯. রবীন্দ্র-রচনাবলী, ষষ্ঠ খন্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ফাল্গুন ১৩৯১, মার্চ ১৯৮৫, পৃঃ ২৪০.

৫০. রবীন্দ্র-রচনাবলী, পঞ্চম খন্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, আবন ১৩৯১, জুলাই ১৯৮৪, পৃ. ৮২২

৫১. রবীন্দ্র-রচনাবলী, ষষ্ঠ খন্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ফাল্গুন ১৩৯১১ মার্চ ১৯৮৫, পৃ. ৬৩৪

৫২. তদেব, পৃ. ৩৪০

৫৩. রবীন্দ্র-রচনাবলী, অষ্টম খন্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, আষাঢ় ১৩৯৩, জুলাই ১৯৮৬, পৃ. ৩২৯

৫৪. তদেব, পৃ. ৩২৯

৫৫. তদেব, পৃ. ৩২৯

৫৬. রবীন্দ্র-রচনাবলী, চতুর্দশ খন্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, মাঘ ১৩৯৮, ফেব্রুয়ারি ১৯৯২, পৃ. ৬০৯

৫৭. মর্মবাণী/শেষ সপ্তক (সংযোজন), রবীন্দ্র রচনাবলী, তৃতীয় খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, ২৫ বৈশাখ ১৩৬৮, পৃ. ২৩২

৫৮. Burnt Norton / Collected Poems (1909-1935) - T.S. Eliot, Faber & Faber, Fifteenth Impression, PP. 190.

৫৯. গীতবিতান - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ কার্তিক ১৪১২, পৃ. ৪৫০ [৫৬ সংখ্যক/প্রকৃতি- আজ শ্রাবণের আমন্ত্রনে'।]

৬০. A Critical History of Greek Philosophy – W.T. Stace, Macmillan & Co. Ltd., London, 1962, PP. 84

৬১. Ibid, PP. 84.

© 2026 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore